আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ।। ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৬৯ সন

প্রথম প্রকাশ
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪

ব্লক
মডার্ন প্রসেস
কলেজ রো
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

উৎসর্গ

শ্রীদিলীপ সেন

প্রীতিভাজনেষু

শ্রীমতী রুবি সেন

সুচরিতাসু

JAKHAN MANUSH HOLAM

by

Ashutosh Mukherjee

যখন মানুষ হলাম

লেখকের অন্য বই

চেনা মুখের মিছিল
সেই অজানার খোঁজে ১ম খণ্ড
সেই অজানার খোঁজে ২য় খণ্ড
ঝংকার
মন যায় যমুনায়
দুটি প্রতীক্ষার কারণে
অপরিচিতের মুখ
কাল তুমি আলেয়া
শিলাপটে লিখা
রাগশর
বাজীকর
নগশৃঙ্গার
বলাকার মন
যার যেথা ঘর
নগর পারে রূপনগর
আমি সে ও সখা
সাবরমতী
বকুলবাসর
পরিণয় মঙ্গল
সাতপাকে বাঁধা

সকালে বিছানায় বসে চা খেতে খেতে আয়েস করে কাগজ পড়া অনেকদিনের অভ্যেস। খবরের কাগজের ভাঁজ খুললেই অঘটন আর চমকের খবর এত থাকে যে চম্‌কে বড় উঠি না। ট্রে-থেকে পেয়ালাটা তুলে নিয়ে প্রথম চুমুকের পর কোলের ওপর আধাভাঁজ করা কাগজটার দিকে সবে চোখ নামিয়েছি।

মাথার দিকে বড় হরফের লাইন দুটো আচমকা মগজে যেন মুগুরের ঘা বসালো। ভরা পেয়ালার খানিকটা চা কাগজের ওপর পড়ল।

উত্তেজনার ধকল সামলানোর চেষ্টায় ধীরে সুস্থে আগে চা-টুকু শেষ করে পেয়ালা সরিয়ে রেখে আবার কাগজে মন দিলাম। হেড-লাইনের নিচে পাশাপাশি দুটো ছবি। পুরুষ আর রমণী। সুপুরুষ আর সুরূপা। ওই পুরুষ আর রমণীর ছবি খবরের কাগজের ভিতরের পাতার বিজ্ঞাপনে কলকাতার শহরতলির আর তামাম রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ অজস্রবার নানা রূপে নানান ভঙ্গিতে দেখেছে। তারা অবন্তিকা নাট্যগোষ্ঠীর পল্লব দত্ত আর উর্মি দত্ত। স্বামী-স্ত্রী। সম্পর্কটা হালের। বড়জোর মাস ছয়েকের। তার আগে দীর্ঘ ন'দশ বছর ধরে সিনেমা আর নাট্যজগতের পত্র-পত্রিকায় এই দুজনের সম্পর্কে অনেক রসালো গুঞ্জন আর জল্পনা-কল্পনা ছাপা হতে-হতে পুরনো হয়ে গেছল। মাস ছয়েক আগে ওই সব পত্র-পত্রিকায় ঘটা করে তাদের আনুষ্ঠানিক বিয়ের খবর আর ছবি ছাপা হয়েছিল। কোনো কোনো কাগজের কটাক্ষ আরো একটু প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছিল। তারা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, এর মাত্র মাস দুই আগে পল্লব দত্তর প্রথম স্ত্রীর অঘটনে মৃত্যুর ফলে এই আনুষ্ঠানিক

বিয়ের পথ প্রশস্ত হতে পেরেছে। জনসাধারণের স্মৃতির মেয়াদ বেশি নয়, কথাটা সত্যি। আট মাস আগে পল্লব দত্তর প্রথম স্ত্রী অবন্তী দত্তর অঘটনে মৃত্যুর মর্মান্তিক খবর সব কাগজেই ফলাও করে বেরিয়েছিল। সকালের কাগজে সেই খবর পড়ে আমি আজকের এই দিনের থেকেও অনেক বেশি ধাক্কা খেয়েছিলাম। আর আধঘণ্টার মধ্যে তার খবর নেবার জন্য হাসপাতালে গিয়েও উপস্থিত হয়েছিলাম। তিন দিন বাদে মৃত্যুর পর অবন্তিকা গোষ্ঠীর অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী অবন্তী দত্তর ছবি কাগজে বেরিয়েছে, খবর ছাপা হয়েছে। কিন্তু তাতে এককালের প্রতিভাদৃপ্ত অভিনেত্রী বিদিশা দত্তর নামের উল্লেখও ছিল না। গত বারো তেরো বছরে বিদিশার নাম দর্শকের স্মৃতি থেকে মুছে যেতেও পারে। কারণ অবন্তি নাট্যগোষ্ঠীর সেটা সংগ্রামের সময়। গোড়ায় গোড়ায় মাসের মধ্যে দু'চার দিনও হল্ পাওয়া সহজ হতো না। যা-ও পাওয়া যেত, মাশুল গুনে লাভের মুখ দেখা শক্ত হতো। তখন বেশির ভাগই শহরতলির মফস্বলের বা বাইরের কল্-শো ভরসা। একই কারণে বিজ্ঞাপনের চটকেরও জোর কম তখন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটু একটু করে অভিনেত্রী বিদিশার প্রতিভার স্বাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। অবশ্যই সে সময়ে দর্শকের প্রধান আকর্ষণ পল্লব দত্ত। নিজের অফিস, অন্যান্য অফিস-ক্লাব আর এদিক সেদিকের অ্যামেচার পার্টির আমন্ত্রণে বলিষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে সে আগে থেকেই স্বীকৃতি পেয়ে আসছিল। অবন্তিকার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হবার পর থেকে তার অভিনয় আরো জমজমাট হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার বিপরীত ভূমিকায় অভিনেত্রীটিকেও বেশিদিন কেউ উপেক্ষা করতে পারে নি। কিছু সময় লেগেছে, কারণ রূপের জলুস বলতে যা বোঝায় তাতে কিছু ঘাটতি ছিল। গায়ের রং কালো, লম্বা দোহারা চেহারা, মুখখানা মিষ্টি, আয়ত চক্ষু। প্রসাধনের বা মেক-আপের উগ্র চটকে হয়তো এই ঘাটতির অনেকটাই মেরে দেওয়া যেত। কিন্তু বিদিশা

নামের বিপরীত ভূমিকার নায়িকাটি নিজের স্বাভাবিক চেহারার ওপরেই বেশি নির্ভর করতে চেয়েছিল। লোকচিত্তে প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারে দেরি হবার এটাও একটা হেতু। কারণ, তার বিপরীতে যার মঞ্চে আবির্ভাব, সে কন্দর্পকান্তি শুধু নয়, তার হাব-ভাব নড়া-চড়া চলন-বলন সবই পুরুষের।

…তবু, সময় লাগলেও ক্রমে এই জুটি দর্শকের চোখ টেনেছে, মন টেনেছে। অবন্তিকা গোষ্ঠীর পায়ের নিচের ভিত জমাট বাঁধছিল, শক্ত-পোক্ত হয়ে ওঠার দিকে এগোচ্ছিল। পত্র-পত্রিকার সমালোচকরা তখন এই জুটির ভবিষ্যত প্রতিশ্রুতি দেখতে শুরু করেছিল। এমন সম্ভাবনা আর অগ্রগতির মুখেই অবন্তিকার বিদিশা নামে অভিনেত্রীটি হঠাৎ একদিন লোকচক্ষুর আড়ালে সরে গেল। মুছেই গেল। তার জায়গায় দর্শক-চোখের সতৃষ্ণ অভ্যর্থনা নিয়ে যে এসে দাঁড়ালো আর একটা বছর না যেতেই বিদিশা নামে অভিনেত্রীটিকে বিস্মৃতির অতলে ঠেলে দিল—সে আজকের খবরের কাগজের শিরোনামে যুক্ত ছবির গরবিনী শিল্পী উর্মি—উর্মিমালা দত্ত। এই তেত্রিশ বছর বয়সেও রূপে ঝলমল, যৌবনে ঝলমল, লোভাতুর দর্শক-চোখের না-মা না-কন্যা না-বধূ উর্বশী। বিজ্ঞাপনের নাট্যোর্বশী উর্মিমালা।

…জনসাধারণের স্মৃতি স্বল্পায়ু বলছিলাম তার কারণ, আট মাস আগে ছবিসহ কাগজে অবন্তিকা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাত্রী অবন্তী দত্তর যে মর্মান্তিক অঘটনের খবর বেরিয়েছিল, অতীতের মাটি খুঁড়ে তার সঙ্গে বারো তেরো বছর আগের সেই শ্যামাঙ্গী আর সাদা-মাটা রূপের অভিনেত্রীর একাত্ম যোগ কেউ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে নি। কিন্তু খবরের কাগজওয়ালাদেরও কিছুই মনে পড়ে নি এটা আমার কাছে একটু আশ্চর্য ঠেকেছিল। …সে-দিনের সেই সাধারণ চেহারার মেয়েটির মধ্যে তারা প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ দেখেছিল, প্রতিশ্রুতির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, সেই বিদিশা মেয়েটিই যে

বারো-তেরো বছর পরের অঘটনের বলি অবন্তী দত্ত, এ তারা একেবারে ভুলে বসল কি করে? সিনেমা পত্র-পত্রিকা নয়, দীর্ঘকাল আমি কলকাতার কোনো নামী দৈনিকের সাহিত্য সম্পাদক ছিলাম। সেই সুবাদে নাট্যমঞ্চের পাতার প্রবীণ সম্পাদকের সঙ্গেও যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। মনে আছে, বছর কয়েক আগেও তিনি হেসেই জিগ্যেস করেছিলেন, বিদিশা তো মুছে গেল, এখন আপনার অবন্তীর খবর কি, নাট্যোর্বশী উর্মিমালাকে বরদাস্ত করতে পারছে?

বিভাগীয় ওই প্রবীণ সম্পাদকটির প্রশ্নে ঠাট্টা তামাশার ব্যাপার কিছু ছিল না। এককালে অবন্তীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের খবর তিনি জানতেন। কিন্তু ওই প্রশ্ন শুনে তাঁর তরুণ সহকর্মীর মুখের মুচকি হাসিটুকু লক্ষ্য করেছিলাম। অর্থাৎ কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তরুণদেরও এককালের অবন্তী-বিদিশা সংবাদ আর পরবর্তী কালের পল্লব-উর্মিমালা সংবাদ অগোচর নয়, এটা স্পষ্ট বোঝা গেছল। যথাসময়ে আমি আর সেই বিভাগীয় প্রবীণ সম্পাদক রিটায়ার করেছি। এবং স্বাভাবিক ভাবেই সেই তরুণ সহকারীটি নাট্যমঞ্চের পাতার সম্পাদক। কিন্তু লক্ষ্য করেছিলাম, অন্য কাগজে তো নয়ই, আমার সেই নিজের কাগজেও দেখেছি অবন্তিকা নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাত্রী এবং অনন্য অভিনেতা পল্লব দত্তর স্ত্রী অবন্তী দত্তর জীবিতকালের ফোটোসহ মর্মান্তিক অঘটনের খবরই শুধু ছিল, তার অভিনয় জীবনের কথা বা বিদিশা নামের কোনো উল্লেখ ছিল না।

...হ্যাঁ, সেদিনের সব কাগজে অঘটনের বলি অবন্তীর ফোটো তো ছিলই, সেই সঙ্গে বিষাদে আচ্ছন্ন পল্লব দত্তর ফোটোও ছিল। আজকের কাগজের উর্মি দত্ত আর পল্লব দত্তর মতো পাশাপাশি নয়, ওপরে নিচে। মৃতের সম্মান আগে। কিন্তু সেদিনও লোকচিত্ত-প্রিয় বরেণ্য শিল্পীর শোকতপ্ত মুখখানাই পাঠকের বেশি নজর কেড়েছিল। দেখে আমার

অন্তত তাই মনে হয়েছিল। হাসপাতালে সেদিন এ-জগতের নারী-পুরুষ বহু শিল্পীর সমাবেশ। মৃতের প্রতি সম্মান আর শোকসন্তপ্ত জীবিতের প্রতি সমবেদনা জানানোর কর্তব্যে হাজির সকলে। তাদের নামও ফলাও করে কাগজে ছাপা হয়েছিল। এর মধ্যে একজন বিশিষ্ট শিল্পী যার নাম ঊর্মিমালা—সেই নামটি অনুপস্থিত, এ কি কেবল আমিই লক্ষ্য করে-ছিলাম? জানি না।

· আট মাস আগের সেই একদিনের কাগজের খবর, সমব্যথীদের কারো সঙ্গে পল্লব দত্ত একটি কথাও বলেন নি, অঘটন সম্পর্কে কারো কোনো দরদী প্রশ্নের জবাব দেন নি। উল্টে নাকি উত্ত্যক্ত বোধ করেছেন। কখনো বা আত্মসমাহিত নীরবতাভঙ্গের কারণে ঈষৎ অসহিষ্ণুও হয়ে উঠেছেন। কেবল সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দুই-এক কথা মাত্র বলেছেন। বলেছেন, যিনি গেলেন তিনি না থাকলে অবন্তিকা গোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকত না, তাঁরও অস্তিত্ব থাকত না।

·· আট মাস আগে কাগজে ছাপা এই অনন্য শিল্পীর ছবির দিকে চেয়ে শুধু আমি আর পল্লব দত্তর ছোট ভাই কল্লোল দত্ত ছাড়া আর কেউ তাকে জীবন্ত ভস্ম করতে চেয়েছিল কিনা জানি না। সেই ছবির মুখের ওপর চোখ রেখে আমি ভস্ম করতে চেয়েছিলাম, আবার এও ভেবেছিলাম, অভিনয় করার ক্ষমতা আছে বটে লোকটার।

···সেদিনের সেই অবন্তীর মৃত নয়, জীবিত দিনের ছবিই কাগজে ছাপা হয়েছিল। তাই হওয়া উচিত। কারণ, শেষের সেই দগদগে বীভৎস মূর্তি মনে পড়লে আজও অন্তরাত্মায় মোচড় পড়ে। যাক, ক্যামেরা ফেসিং হওয়ার দরুন যে দেখবে মনে হবে ফোটোর মেয়ে তার দিকেই চেয়ে আছে। মেয়ে বলছি, কারণ অবন্তীর সেটা বেশি বয়সের ফোটো নয়। বড় জোর সাতাশ আটাশ বছর বয়সের। তা-ও মনে হয় না। আয়ত চোখ, শান্ত স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব। সেই ফোটোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে

হঠাৎ আমি চমকে উঠেছিলাম মনে আছে।

—'কাকু, আমার অবন্তী নাম যখন তুমি দাও, তখন কালিদাসের কালের অবন্তী-বিদিশা-উজ্জয়িনী এই তিন নামই কি তোমার মাথায় এসেছিল? অবন্তী থেকে নাটকের জীবনে বিদিশায় চলে এলাম। আজ আষাঢ়ের প্রথম দিনে আকাশের কোঁচকানো মেঘের দিকে চোখ পড়তে হঠাৎ আমার মনে হলো উজ্জয়িনীর পথে দাঁড়িয়ে আমি এই যুগের কোনো কালিদাসকে খুঁজছি যার কল্পনায় রামগিরিতে নির্বাসিত বিরহী কোনো যক্ষ নয়, নির্বাসিত কোনো এক যক্ষপ্রিয়া—তারও বার্তাবহ দূত হবে আষাঢ়ের এই নতুন মেঘ। ভাবছ হয়তো মেয়েটা হঠাৎ পাগল-টাগল হয়ে গেল কিনা। সত্যি বলছি কাকু, আষাঢ়ের এই প্রথম দুপুরে জানলার সামনে বসে আকাশের মেঘ দেখতে দেখতে আমার মাথার ভিতরে এই উদ্ভট চিন্তাটা গিসগিস করতে লাগলো। আর তারপরেই তোমাকে লিখতে বসে গেলাম। উল্টো মেঘদূত কি হয় না? আমার বিশ্বাস সব দেশে সর্ব কালে হয়। এই মাত্র মনে হলো কালিদাস ছেলে না হয়ে মেয়ে কবি হলে বিরহের অমন অমর মুকুটখানা যক্ষের বদলে নিশ্চয় যক্ষপ্রিয়ার মাথাতেই বসিয়ে দিত। কালিদাস না লিখুক, তুমি একখানা উল্টো মেঘদূত লেখো না কাকু? বয়স আমার সবে একত্রিশ এখন, যদি লেখো তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি, বিদিশাকে বাতিল করে, রূপ আর যৌবনের ডালি ঊর্মিমালাকেও বাতিল করে একদিন না একদিন এই অবন্তী দত্তই মঞ্চে উত্তর-মেঘ আর পূর্ব-মেঘের ঝড় বইয়ে দেবে—সেই ঝড়ে দিশেহারা তোমাদের বিরাট অভিনেতা পল্লব দত্তর বুকের তলার হাহাকার দেখে দর্শকও হায় হায় করবে। নাঃ, আর না। এ চিঠি নিছক বাচালতা মনে হলে ছিঁড়ে ফেলে দিও আর হেসো। রাগ করতে পারবে না জানি। প্রণামান্তে তোমার স্নেহের অবন্তী।'

…আমি চমকে উঠেছিলাম কারণ কাগজের ফোটোতে অবন্তী সোজা

আমার মুখের দিকে চেয়ে প্রায় ফিসফিস মিষ্টি গলায় হুবহু ওই চিঠির কথাগুলো নতুন করে আবার আমাকে বলছিল।…সেই চিঠি পড়ে আমি হেসেছিলাম বটে, কিন্তু ছিঁড়ে ফেলি নি। বরং যত্ন করে আমার চিঠির সঞ্চয়ের ফাইলে রেখে দিয়েছিলাম। পুরনো সেই চিঠির ফাইল ওলটাতে বসে অবন্তীর ওই চিঠিও কতবার পড়েছি ঠিক নেই। ওই মেয়ে বাংলায় ভালো অনার্স পেয়ে বি. এ. পাশ করেছিল। এম. এ. পড়তে পড়তে ওই পর্বে জলাঞ্জলি দিয়ে বসেছিল তাও জানি। ওর বাবা-মা আর দুই দাদা রাগে ফেটে পড়েছিল। আমারও খেদ বা ক্ষোভ কম হয় নি। যাক, সেই মেয়ে সাদা-মাটা অর্থবহ একটা চিঠি এত সুন্দর করে লিখতে পারে, ও চিঠি ফাইলে রাখার সেটাই তখন কারণ। মঞ্চ থেকে বিদিশার নাম মুছে গেলেও অবন্তীকে তখনো আমি অবন্তিকা নাট্যগোষ্ঠীর কর্ত্রীস্থানীয়া বলেই জানি। সে-যে কত ভুল যদি ধারণা থাকত। যাই হোক, সেই চিঠিটাকে গল্পের জন্য বায়না বা আব্দার ছাড়া আর কিছু ভাবি না। ধরে নিয়েছিলাম, মুছে যাওয়া বিদিশাকে বাতিল করে এখন স্বনামে আবার মঞ্চে জায়গা করে নেবার ইচ্ছে। আর রূপ-যৌবনের ডালি উর্মিমালাকে বাতিলের ইচ্ছাটাও শব্দার্থক হতে পারে না। শহর শহরতলি মফস্বল বা এই বাংলার বিভিন্ন জায়গার মঞ্চজগতে আজ যেখানে সে সদর্পে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে তাকে ঠাঁই-নাড়া করার চিন্তা কোনো প্রতিষ্ঠান করবে না। আর পাঁচটা প্রতিষ্ঠান তাকে লুফে নেবার জন্য কাড়াকড়ি শুরু করবে। ভাবপ্রবণ হলেও এটুকু ব্যবসা-বুদ্ধি অবন্তীর আছে বলেই জানি। চিঠিতে যা সে বোঝাতে চেয়েছে, উর্মিমালার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর ভূমিকায় মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ানোর মতোই কোনো কাহিনী বা আখ্যান তার চাই। সেটা কি ধরনের হবে, উল্টো মেঘদূত লেখার উপমা দিয়ে তারই কিছু আভাস দিয়েছে। সে-সময় ওই চিঠির সম্পর্কে আমার বিশ্লেষণ এটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

…বছরের পর বছর গেছে। অবন্তী দত্ত আর জাঁদরেল অভিনেতা পল্লব দত্তর জীবনের ধারা যে শুকনো মরুপথে বিলীন হতে চলেছে তার খবর কানে আসে। ছোট-বড় সংঘাতের খবরও শুনি। কয়েকটা ঘটনার আমি নীরব সাক্ষীও বটে। মেয়েটার জন্য বড় দুঃখ হয়। কত বড় অন্ধ বিশ্বাসেই না বাবা-মা দুই দাদা, এমন কি আমারও একান্ত অবাধ্য হয়ে জীবনের এই গ্রন্থিতে বাঁধা পড়েছিল।…কিন্তু ততদিনে ওই চিঠির কথা আমি ভুলে গেছি। প্রায় এগারো বছর বাদে, আট মাস আগে কাগজে অবন্তী দত্তর অঘটনের খবর পড়ে হাসপাতালে ছুটে গেলাম। সেখানে অবন্তীর মেয়ে-জামাই আলো আর বিকাশের সঙ্গে দেখা হয়েছে। অবন্তীর সমবয়সী দেওর কল্লোল বা কালুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। দেখা হয়েছে অবন্তীর লোকচিত্তজয়ী অভিনেতা স্বামী পল্লব দত্তর সঙ্গেও। সে বাঁকুড়া না কোথায় দল নিয়ে অভিনয় করতে গেছল। আগের রাত্রিতেই তাকে ফোনে দুর্ঘটনার খবর দেওয়া হয়েছে। পরের কয়েক জায়গার শো বাতিল করে এই সকালের মধ্যেই সে চলে এসেছে।

এর তিন দিন বাদে কাগজে অবন্তীর মৃত্যুর খবর। ফোটোর দিকে চেয়ে এগারো বছর আগের লেখা সেই চিঠি আমার হুবহু মনে পড়েছে। শুধু মনে পড়া নয়, তার ফিসফিস মিষ্টি গলায় ওই চিঠির বয়ান যেন কানে শুনেছি। ফোটোর আয়ত দুই চোখ আমার মুখের ওপর। স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তিটুকুই শুধু আগে চোখে পড়েছিল। তখন মনে হলো, ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু হাসির মতো লেগে আছে। চোখেও কি খুব চাপা কৌতুকের আভাস দেখেছিলাম একটু?

…নিজেই সে উল্টো মেঘদূত রচনা করে জীবন-মঞ্চের শেষ অভিনয় করে এমন চমক লাগিয়ে বিদায় নিল? উত্তর-মেঘ আর পূর্ব-মেঘের ঝড় বইয়ে দিল? এই ঝড়ে দিশেহারা অভিনেতা পল্লব দত্তর বুকের তলার হাহাকার কি কোনো দর্শক দেখেছে? হায় হায় করছে।

এমন তো মনে হয় নি। মনে হয়েছে হাসপাতালে গিয়ে পল্লব দত্তর বুকের তলায় অভিনেতার হাহাকার দেখেছি, আর তাই দেখে মৌন-মুগ্ধ দর্শকের তারিফের হায়-হায় দেখেছি।···মেয়ে আলো কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। মাঝে মাঝে ফিটও হয়ে যাচ্ছিল। জামাই বিকাশের থমথমে কঠিন মুখ। শ্বশুরের দিকে একবার সে ফিরেও তাকায় নি। আর আগুনের ফুলকি দেখেছিলাম পল্লবের ছোট ভাই কল্লোল—কালুর' চোখে মুখে। বউদিকে কত ভালোবাসত জানতাম। দুজনে সমবয়সী, চুল-চেরা হিসাবে অবন্তী মাস দেড় দুইয়ের বড় ছিল নাকি। অর্থাৎ তার বয়েসও তখন চল্লিশ একচল্লিশ। অবন্তী নাকি বলত, আমার জন্য ছেলেটা বিয়ে পর্যন্ত করল না।·· অত লোকের মধ্যে হাসপাতালের করিডোরে সেই কালু দত্তকে বাঘের মতো পায়চারি করতে দেখেছি। শিকার তার সামনেই মাথা নিচু করে বসে। হিংস্র আক্রোশে কালু দত্ত এক একবার তাকে চোখ তুলে দেখেছে। এমন কি দুই একবার তার সামনে গিয়েও দাঁড়িয়েছে। পল্লব দত্ত তখনো মুখ তুলে তাকায় নি। আমার মনে হয়েছিল ভাইয়ের দিকে মুখ তুলে তাকানোর সাহসও তার ছিল না। কালু আমার কাছে এসে গলায় শ্লেষের আগুন ঝরিয়ে বলেছিল, ভালো করে শোকের অভিনয় দেখে নিন, ···কিছু যদি হয়ে যায়—যায় কেন, যাবেই—এই শোক দেখানো বার করছি আমি···আপনি জেনে রাখুন এটা দুর্ঘটনা নয়, এটা আত্মহত্যা, এটা ইচ্ছামৃত্যু, অনেক বছরের অমানুষিক প্ররোচনায় বউদিকে এই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, আমার কাছে তার অনেক প্রমাণ আছে, শেষ মোক্ষম প্রমাণ আলো আর বিকাশের কাছে আছে—রাগের মাথায় বিকাশ সে-কথা আমাকে বলেছে। আপনার থেকে বেশি ভক্তিশ্রদ্ধা বউদি নিজের বাবা-মাকেও করত না—আপনার কাছেও কিছু প্রমাণ থাকতে পারে—কিছু হয়ে গেলে আমি ওকে হাতে শেকল পরিয়ে কোর্টে টেনে নিয়ে যাব—এই আত্মহত্যা হত্যা কিনা সেটা প্রমাণ করতে ওর কালঘাম

ছুটে যাবে—ওর অভিনয় করা এই জীবনের মতো আমি শেষ করে ছাড়ব।

…এই চাপা গর্জন অদূরের ওই মানুষটার একেবারে কানে না যাবার মতো নয়। কালুর দাদা মুখ তুলতে পারে নি, কিন্তু মুখ নিচু করেই দুই একবার তাকে এদিকে ঘাড় ফেরাতে দেখেছিলাম।

কালু দত্ত মিথ্যে গর্জন করে নি, মিথ্যে আস্ফালন করে নি। অবন্তী দত্তর মৃত্যু দুর্ঘটনার কারণে নয়, হত্যার সামিল দীর্ঘদিনের প্ররোচিত আত্মহত্যা তা প্রমাণ করার জন্য দুর্জয় ক্রোধে সে প্রস্তুতই হয়েছিল।

বাধা পড়েছে দুটো কারণে।

প্রথম কারণ, মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে বার কয়েক অবন্তীর জ্ঞান ফিরেছিল, মিনিট কয়েকের জবানবন্দীতে পুলিশকে সে বলেছে, এটা দুর্ঘটনা, শাড়ির আঁচলে ধরে স্টোভ থেকে রান্নার প্যান নামাতে গিয়ে কাপড়ে আগুন ধরে যায়—এই অ্যাকসিডেন্টের জন্য সে নিজে ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। কেরোসিনের গন্ধ পাবার কারণ বলছিল, স্টোভে তেল ঢালার সময় মাটিতে খানিকটা কেরোসিন পড়েছিল আর শাড়িতে আগুন লাগতে হাতের ধাক্কায় স্টোভও উল্টে গেছল। এটুকু বার করতেই পুলিশের ধকল পোহাতে হয়েছে। যে ধরনের কাপড়ে মুহূর্তে আগুন ধরে গায়ের সঙ্গে চেপটে যায় সে-রকম শাড়ি পরে সে স্টোভ জ্বালিয়ে বসেছিল কেন এর উত্তর পুলিশ আর চেষ্টা করেও বার করতে পারে নি। অবন্তীর জ্ঞান ছিল না।

…দ্বিতীয় বাধাটাই আসল বাধা। অবন্তী দত্তর ওই জবানবন্দী সত্ত্বেও জল ঘোলা করতে চাইলে পুলিশের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে তা অনেকটাই করা যেত। সন্দেহ ঢোকানোর মতো সব থেকে বড় অস্ত্র অবন্তীর মেয়ে-জামাই আলো বিকাশের কাছেই ছিল। কিন্তু এ-ব্যাপারে সব থেকে বেশি বাধা এসেছে আলোর কাছ থেকেই। আর কিছুই করতে রাজি

হয় নি বলে কাকু মানে কালু দত্ত আর মামাবাড়ির দুই মামা, দাদু-দিদা সকলেই আলোর ওপর ক্ষিপ্ত !···বাবাকে যত ঘৃণা করে এত ঘৃণা আলো পৃথিবীতে আর কাউকে করে না। তবু এ-ব্যাপারে কেউ ওকে টলাতে পারে নি। ওর এক কথা, শেষ বার জ্ঞান ফিরতেই অতি কষ্টে মা ওকে যা বলে গেছে, তারপর শুধু দেখে যাওয়া ছাড়া এখন আর কিছুই করার নেই। বাবাকে এখন পুলিশের টানা হেঁচড়ার মধ্যে ফেললে মায়ের আত্মাই সব থেকে কষ্ট পাবে।···মা যা বলে গেছে আলো তার সঙ্গে আদৌ একমত নয়, তবু যে-বিশ্বাস নিয়ে মা চোখ বুজেছে, এখন এ-সব করতে গেলে মায়ের সেই বিশ্বাসের ওপরেই অশ্রদ্ধার আঘাত পড়বে। মা শুনেছে কিনা আলো জানে না, ও চিৎকার করে কথা দিয়েছিল মায়ের কথা রাখবে।

ওদের বেহালার বাড়িতে ফোন নেই। বাইরে কোথাও থেকে ফোনে আকুল গলায় আলো আমাকেও বলেছিল, দাদু, তোমাদের নাত-জামাই আর মামাবাড়ির সকলের সঙ্গে ঘোঁট পাকিয়ে কাকু এ কি করতে যাচ্ছে! আমাকেও শাসাচ্ছে, মায়ের শেষ চিঠি তার হাতে না দিলে সম্পর্ক রাখবে না—মা-কে যদি তুমি সত্যিই ভালোবেসে থাকো দাদু তাহলে কাকুকে তুমি থামাও—এক তোমার কথাই সে কেবল শুনতে পারে—মা যে এ-সব করতে নিষেধ করে গেছে—চোখ বোজার আগেও মায়ের বিশ্বাসের জোর দেখলে তুমি অবাক হয়ে যেতে—কাকুকে আমি বলেছি, মা দাদুকে নিজের বাবার থেকেও বেশি ভালোবাসত, দাদুর কাছে যাও—সে যা বলবে তাই হবে। দোহাই দাদু, কাকু গেলে তুমি তাকে ঠাণ্ডা করো, বোঝাও—

আমি জিগ্যেস করেছিলাম, তোর মা শেষ চিঠিতে তোকে কি লিখেছিল, আর জ্ঞান হতে হাসপাতালে তোকে কি বলেছিল ?

—এ-সব কথা ফোনে বলা যাবে না দাদু, সময়ে তোমাকে আমি সব

বলব—আমার থেকে বড় ক্ষতি কারো হয় নি, তবু বলছি রাগের মাথায় কাকু যা করতে চাইছে আমি তা করতে দেব না—তোমার কাছে গেলে তুমি তাকে আটকাও।

না, এর পর কালু দত্ত আর আমার কাছে আসে নি। হয়তো আলোর চেষ্টাতেই শেষ পর্যন্ত ওর মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে। সময়ে আলো আমাকে সব বলবে বলেছিল, কিন্তু গত আট মাসের মধ্যে সে-ও আর আমার কাছে আসে নি। আমার দিক থেকেও কোনোরকম ঔৎসুক্য দেখা যায় নি। কৌতূহল মেটাবার জন্য বেদনার স্মৃতি আবার খুঁচিয়ে দগদগে করে তুলে কি লাভ।

···মাস দুইয়ের মধ্যে কাগজে অভিনেতা পল্লব দত্ত আর দর্শকচিত্তের না-মাতা না-কন্যা না-বধূ নাট্যোর্বশী উর্মিমালার বিয়ের খবর দেখেছি। সিনেমা পত্রিকাগুলিতে নব-দম্পতির হাসিমুখের ছবিও চোখে পড়েছে। এই আনুষ্ঠানিক বিয়ে সম্পর্কে সেই সব কাগজে কিছু রসালাপ আর প্রগল্‌ভ কটাক্ষপাতও ছিল। উর্বশীর প্রণয়-বন্ধন চিরকালের মানুষ ছেড়ে চিরকালের দেবতাদেরও কাম্য। কিন্তু উর্বশীর পরিণয়-বন্ধনের ব্যাপারখানা যেন প্রণয়ের চিরবহতা স্রোতকে কোনো সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বেঁধে ফেলার মতো। সেটা যে রসপিপাসুদের কাছে কত অসহ্য, তার পৌরাণিক নজির শতপথব্রাহ্মণ। মানুষ পুরুরবার সঙ্গে উর্বশীর পরিণয়-বন্ধন স্বর্গের সতৃষ্ণ দেবতারাও সহ্য করতে পারে নি। ছলে কৌশলে মর্ত্যের পুরুরবার কাছ থেকে আবার তাকে উদ্ধার করে এবং স্বর্গভূমিতে স্থাপন করে তবে তারা নিশ্চিন্ত। মোট কথা, উর্বশী কোনো একজনের ভোগবতী হলে সেটা বুঝি রসের কাব্যে ছন্দপতনের মতো। পুরুষ-রমণী দুই শিল্পীর দীর্ঘদিনের প্রণয়-বন্ধন পাকাপোক্ত পরিণয়-বন্ধনের মোহনায় এসে থামতে ওই সব পত্র-পত্রিকায় প্রচ্ছন্ন হুল-ফোটানো রসালাপ আর প্রগল্‌ভ কটাক্ষপাত দেখে উর্বশী সম্পর্কে এই

গোছের একটা দার্শনিক তত্ত্ব আমার মাথায় এসেছিল। কাগজের এই যুগল ছবি দেখে বা এই আনুষ্ঠানিক বিবাহ-সংবাদ পড়ে নাট্যোর্বশী ঊর্মিমালার শত সহস্র ভক্তদের মধ্যে (অবশ্যই তারা পুরুষ) কত জন খুশি হয়েছে আর তার কত-শত জনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছে অবশ্যই সেটা অজানাই থেকে যাবে।

যাক, পাঠক কেবল বিশ্বাস করতে পারেন এই বিয়ে নিয়ে অথবা এই দুটি পুরুষ-রমণীকে নিয়ে এই প্রৌঢ় লেখকের মনে এতটুকু কৌতূহল ছিল না। গোচরে বা অগোচরে যে-টুকু ছিল তা কেবল ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা। তবে এই ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা নিয়েও বেশ কিছুদিন ধরে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে যাচ্ছিলাম, অবন্তিকার অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে মাঝে মাঝেই তাদের প্রধান অভিনেতার নাম অনুপস্থিত থাকছে। আমার দীর্ঘ কর্ম-জীবন কাগজ আর পত্র-পত্রিকা ঘেঁটেই কেটেছে। সব কিছু খুঁটিয়ে পড়া অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কোনো কোণের কোনো ক্ষুদ্রাকারের বিজ্ঞাপনও আমার কাছে অপাঠ্য নয়। সে-কারণেই ওই ব্যতিক্রমটা চোখে পড়েছে। তাছাড়া ব্যতিক্রমটা ছোটও কিছু নয়। অবন্তিকার বিজ্ঞাপনের দিকে তাকালেই বড় বড় হরফের দুটো জোড়া নাম জ্বলজ্বল করতে দেখাই সকলের চোখ অভ্যস্ত। ওমুক ভূমিকায় নটসম্রাট পল্লব দত্ত। ওমুক ভূমিকায় নাট্যোর্বশী ঊর্মিমালা। তার মধ্যে মাঝে মাঝেই নটসম্রাটের নাম অনুপস্থিত এ শুধু আমার কেন, অনেক রসপিপাসু জনেরই হয়তো চোখে পড়েছে। বিজ্ঞাপনে তখন আরো ঢের বড় হরফে নাট্যোর্বশীর নাম আর ছবি, তার নিচে বিশেষণ ভূষিত অমিতশক্তিধর কোনো বদলী নায়কের নাম। এই ব্যতিক্রম মাঝে মঝেই লক্ষ্য করে যাচ্ছিলাম।…পল্লব দত্তর অভিনয়-প্রতিভার ধার কমে এসেছে বা আসছে এমন ভাবারও কোনো কারণ নেই। যে-দিন যে অনুষ্ঠানে প্রধান পুরুষ ভূমিকায় তার আবির্ভাব, পরে কাগজের সমালোচনায় তাকে নিয়েই

বিপুল উচ্ছ্বাস। নাট্যোর্বশী ঊর্মিমালার প্রশংসাও অবশ্যই থাকে। তারও অভিনয় ক্ষমতা এত বছরে কম কিছু নয়, অবন্তীর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ঊর্মিমালার অভিনয় আমি অনেকবারই দেখেছি। সে মঞ্চে উপস্থিত হলে তার তূণে রূপ-যৌবন আর দেহসৌষ্ঠবের শরগুলো যত তীক্ষ্ণ, পল্লব দত্তর মুখোমুখি তুল্যমূল্য বিচারে অভিনয়ের শর ততো তীক্ষ্ণ নয়—এ আমার অন্তত মনে হয়েছে। কিন্তু এমন নিক্তির বিচার ক'জনের আর। নন্দনবাসিনী উর্বশীর ভালো নাচই কি দেবতাদের কাছে সব থেকে বড় আকর্ষণ না আর কিছু? মানুষ কোন্ ছাড়।

যাক, বিজ্ঞাপনের এই ব্যতিক্রম বেড়েই চলেছে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলাম। এর পর মাঝে মাঝে নয়, প্রধান পুরুষ ভূমিকায় পল্লব দত্তর নাম প্রায়ই অনুপস্থিত। প্রথমে চোখ টানার মতো নাট্যোর্বশী ঊর্মি দত্তর ছবি আর নামের নিচে প্রধান পুরুষ ভূমিকায় ক্রমে আর একটি নাম স্থায়ী হয়ে উঠতে লাগল। মলয় গুপ্ত। বিজ্ঞাপনে ঊর্মিমালার নিচে মাঝে মাঝে তার ছবিও বেরুচ্ছে। সেই ছবি দেখে পল্লবের মুখখানা মনে পড়েছে। পল্লব দত্তর মতো কন্দর্পকান্তি বলিষ্ঠ পুরুষ আদৌ নয়। কিন্তু লম্বার ওপর ভারী মিষ্টি আর স্মার্ট চেহারা। বেশির ভাগ নায়ক-নায়িকা-প্রধান কাহিনীতে পার্শ্ব চরিত্রের অভিনয়-ক্ষমতা দেখাবার সুযোগ আর কতটুকু। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছেলেটার ভবিষ্যত ভালো মনে হয়েছিল আমার। অমন জাঁদরেল দুই নায়ক-নায়িকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অভিনয় করার সময়ে কোনোরকম জড়তা চোখে পড়ে নি। অভিনয় যেটুকু করত বেশ সহজ আর অকৃত্রিম মনে হতো।

অবন্তীর মৃত্যুর আট মাসের মধ্যে শেষের এই চার মাসের বিজ্ঞাপনে নটসম্রাট পল্লব দত্তর নাম একেবারেই অনুপস্থিত। কেন অনুপস্থিত তা নিয়ে অবন্তিকার তরফ থেকে কোনো কৈফিয়ত নেই। নেই তো নেই-ই আর তার জন্য ওই নাট্যগোষ্ঠীর কারো যেন মাথাব্যথাও নেই। কিন্তু

নাটক-সিনেমার পত্র-পত্রিকাগুলোর কৌতূহল ছাইচাপা থাকে কি করে? তাদের প্রত্যেক সংখ্যার প্রশ্ন, পল্লব দত্তকে আর মঞ্চে দেখা যাচ্ছে না কেন? তিনি কি অসুস্থ? তিনি কি এই ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ বছর বয়সেই মঞ্চ থেকে অবসর নিলেন? ওই সব কাগজের রিপোর্টাররা বাড়িতে ইণ্টারভিউ নিতে গিয়েও ফিরে ফিরে এসেছে। পল্লব দত্ত বা ঊর্মি দত্ত কারোই দেখা মেলে নি। কোনো কোনো কাগজের রিপোর্টার আবার সরবে সন্দিগ্ধ—বাড়িতে থেকেও তাদের নেই বলে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিনা? ভাগ্যবান দুই একজন শেষ পর্যন্ত অবন্তিকার অনুষ্ঠানের দিনে মঞ্চগৃহে গিয়ে নাট্যোর্বশীর দেখা পেয়েছে। কয়েক মিনিটের সাক্ষাতে ঊর্মি দত্তকে নাকি খুব উদ্বিগ্নই দেখা গেছে। পল্লব দত্তর দীর্ঘ অনুপস্থিতির ওপর যেটুকু আলোকপাত সে করেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়ে নিবৃত্তির বদলে পাঠকের কৌতূহল আরো বাড়াই স্বাভাবিক। একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ হুবহু তুলে ধরছি।

'প্রশ্ন : পল্লব দত্তর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে চার মাস পর্যন্ত প্রথমে মাঝে মাঝে এবং পরে প্রায়ই তিনি অভিনয় করতেন না—কেন?'

'উত্তর : আপনাদের নটসম্রাট যত বড়ই অভিনেতা হোন, মানুষ তো··· অমন একটা বীভৎস মৃত্যুর শক্ কি চট করে কাটিয়ে ওঠার মতো?'

'প্রশ্ন : কিন্তু অত বড় শক কাটিয়ে দু'মাসের মধ্যেই তিনি তো আপনাকে বিয়ে করলেন?'

'উত্তর : সেই কৃতিত্ব ওঁর থেকে আমারই বেশি বলতে পারেন। সেটা আমার এত বড় এক শিল্প প্রতিভাকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানোর চেষ্টার ফল।'

'প্রশ্ন : কিন্তু তারপর থেকে তাঁর মঞ্চে অনুপস্থিতি ক্রমে আরো বেড়ে গেল কেন?'

'উত্তর : মাঝে-মাঝেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন, বিশ্রামের জন্য প্রায়ই

তাঁকে বাইরে পাঠিয়ে দিতাম।'

'প্রশ্ন : অসুস্থতা শারীরিক না মানসিক?'

'উত্তর : নিশ্চয় শারীরিক।'

'প্রশ্ন : এর পর গত চার মাসের মধ্যে তিনি আর একদিনও অভিনয় করেন নি···এর কারণ কি তিনি আরো বেশি অসুস্থ?'

'উত্তর : হ্যাঁ।'

'প্রশ্ন : কি অসুখ?'

'উত্তর : (ঈষৎ ইতস্তত করে) নার্ভের অসুখ।'

'প্রশ্ন : এখন তিনি কলকাতায় না বাইরে?'

'উত্তর : এখন কলকাতায়···তবে অনেক সময়েই বাইরে থাকেন।'

'প্রশ্ন : তা নার্ভের অসুখ তো একটা স্বাভাবিক ব্যাপার, যে-কোনো লোকের হতে পারে, কিন্তু এ নিয়ে আপনারা এমন চুপচাপ কেন— আমাদের এত লেখালিখির জবাবে কোনো স্টেট্‌মেণ্ট দিচ্ছেন না কেন?'

'উত্তর : সেটা আপনাদের নটসম্রাটের অভিপ্রেত নয় বলে। এখন অভিনয় না করলেও এই নাট্যগোষ্ঠীর তিনিই সর্বে-সর্বা।'

'প্রশ্ন : তিনি অভিনয় না করার ফলে আপনাদের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে না?'

'উত্তর : তাঁর মতো অভিনেতা অনুপস্থিত এটাই বড় ক্ষতি। (হেসে) প্রত্যেক শো-তে হাউস-ফুল টাঙানো হচ্ছে দেখতেই তো পাচ্ছেন··· আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে না।'

'প্রশ্ন : এটা নিশ্চয় আপনার কৃতিত্ব?'

'উত্তর : সব কৃতিত্বই আপনাদের নটসম্রাটের। এখানকার সংগঠন আর সব শিল্পীরাই তাঁর হাতের তৈরি।'

'প্রশ্ন : পল্লব দত্ত সম্পর্কে এমন নীরবতার ফলে অনেকের সংশয় আপনাদের বিবাহিত জীবনে কোনোরকম অশান্তির কারণ ঘটল কিনা···আপনি

এর কোনো উত্তর দেবেন ?'

'উত্তর : না দেবার কি আছে। (প্রথমে মিটিমিটি হাসি, তারপর অনিন্দ্য-সুন্দর প্রশস্ত হাসি, তারপর হাল্কা-মিষ্টি উল্টো প্রশ্ন) আমাকে দেখে আপনার কি মনে হয় ?'

'প্রশ্ন : (হেসে) থাক, জবাব পেয়েই গেলাম, আর একটাই জিজ্ঞাস্য, পল্লব দত্তকে আবার কতদিনের মধ্যে মঞ্চে আশা করব ?'

'উত্তর : (সুন্দর মুখে সুচারু দুশ্চিন্তার ছায়া) এর জবাব আমি জানলে তো হাঁপ ফেলে বাঁচতাম।...কথায় কথায় তিনি বলছিলেন, শিল্পী হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে প্রতিভা যখন তুঙ্গে তখনই তাঁর সসম্মানে বিদায় নেওয়া উচিত। শুনে আমি ভয়ে কাঁটা, সে-রকমই কোনো উদ্ভট বায়ু মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে কিনা কে জানে ?'

...সাক্ষাৎকারের এই বিবরণটুকু পাঠকের স্মার্ট আর মিষ্টি লাগতে পারে। কিন্তু আদৌ অকৃত্রিম মনে হয় কি ? কৌতূহলের নিবৃত্তি হবে কি ? আমার অন্তত হয় নি। হবে না।

এর কিছুদিন বাদে অন্য এক নাট্যগোষ্ঠীর কোনো কর্তাব্যক্তি তাঁদের এক অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন। কথায় কথায় তাঁর মুখে পল্লব দত্তর মঞ্চে অনুপস্থিতির জল-ভাতের মতো একটা কারণ শুনেছিলাম। তিনি মুচকি হেসে বলেছিলেন, দিনে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রক্ত-মাংসের মানুষটা যদি কম করে বিশ ঘণ্টা মদে বেহুঁশ হয়ে থাকে নটসম্রাটের তাহলে মঞ্চে আবির্ভাব ঘটে কি করে ?

এটা একটা সহজ সঙ্গত কারণ হতে পারে বটে। উঠতি বয়সেই মদ আমি কম খেতে দেখি নি ওকে—আর বিশেষ করে এই কারণেই পাড়ার একটা নুইসেন্স ভাবতাম ওকে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে অন্য প্রশ্ন ওঠে, নাট্যোর্বশী যার পাকা-পোক্ত ঘরনী, মাত্র ছ'মাসের মধ্যে তার এই হাল আর এমন অধোগতি হয় কি করে ?

খানিক আগে বলেছি এই দুটি পুরুষ-রমণীর ব্যক্তি-জীবন নিয়ে আমার কোনো কৌতূহল নেই। যা আছে তা কেবল ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা। কিন্তু মুশকিল হলো, এই দুজনের প্রসঙ্গ কোথাও দেখলে বা মনে হলে অবন্তী যেন চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। তাতে আমার স্নায়ুর ধকল বাড়ে। তাই আমি ভাবতে চেষ্টা করি অবন্তী নামে অনেকটা সাধারণ আর কিছুটা অসাধারণ এক মিষ্টি মেয়ের একচল্লিশ বছরের জীবনের অঙ্কে পূর্ণচ্ছেদ পড়েই গেছে। এই বেদনার স্মৃতিটুকুও মন থেকে মুছে ফেলতেই চেষ্টা করি।

···আট মাস বাদে আজকের সকালের ছোট-বড় সমস্ত কাগজে এই ভীষণ চমক! শরীরের রোমে-রোমে কাঁটা দিয়ে ওঠার মতো চমক। স্নায়ুবিভ্রম ঘটাবার মতো চমক। আটকলম জোড়া হেড-লাইন।

অভিনেতা স্বামীর হাতে অভিনেত্রী স্ত্রীর মর্মান্তিক জীবনাবসান।

হেডিং-এর নিচে কাগজের মাঝের চার কলমে পাশাপাশি দুজনার বড় বড় ছবি। আগে অভিনেত্রী স্ত্রী উর্মিমালা দত্তর। পরে তার অভিনেতা স্বামী পল্লব দত্তর। বড় হরফে প্রথম দু'কলম-জোড়া খবর উপস্থাপনার সার: কাল রাত আনুমানিক এগারোটায় নিজেদের বাসগৃহের শয়ন-ঘরে অবন্তিকা নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক এবং প্রধান অভিনেতা পল্লব দত্ত (দীর্ঘদিন ধরে অজ্ঞাত কারণে যিনি মঞ্চে অনুপস্থিত) তাঁর রূপসী এবং যশস্বিনী স্ত্রী নাট্যোর্বশী উর্মি দত্তকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছেন। তাঁর সুন্দর মুখে অনেক আঘাতের চিহ্ন বর্তমান। আঘাতে আঘাতে প্রথমে তাঁকে কাবু করে তারপর গলা টিপে মারা হয়েছে।

এর নিচে ছোট হরফের বিস্তারিত বিবরণ।

কিন্তু সে-দিকে না এগিয়ে আমি ফোটো দুটোর দিকে চেয়ে আছি। চেয়ে থাকতে থাকতে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ায় আমার ভিতরটা স্তব্ধ হয়ে আসছে। শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল থেমে আসছে। এই ভোরের

আলোয় ঘরে আমি যেন কোনো অশরীরীর আবির্ভাব অনুভব করছি। অদৃশ্য শরীর নিয়ে সে যেন কাগজের ওই ফোটো দুটোর পিছনেই দাঁড়িয়ে। কল্পনায় অদৃশ্য কোনো মেয়ের গনগনে চোখ-মুখ হিংস্র হয়ে উঠতে দেখছি, যার অশ্রুত গলার হিসহিস আগুন আমার কানে বাজছে —বেশ হয়েছে! এই ঠিক হয়েছে! এত দিনে ধর্মের কল বাতাসে নড়েছে! এবারে ওই শয়তানের ফাঁসি হোক—ফাঁসি হোক! দরকার হলে কালুর সঙ্গে এবারে কোর্টে গিয়ে তুমি ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দাও— আলোর কথা আর শুনো না, তার কাছে যে প্রমাণ আছে তা বার করে নাও—ওর এত দিনের সুন্দর মুখোশ খুলে দিয়ে ভিতরের নৃশংস চেহারাটা সকলকে দেখিয়ে দাও! ধরা পড়েছে না পালিয়েছে?

না, কোথাও আমি যাই নি। কাগজ কোলে, চায়ের পেয়ালা হাতে এই বিছানাতেই বসে ছিলাম। একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আত্মস্থ হয়ে এখানেই ফিরে এলাম। চরিত্রগত ভাবে আমি খুব একটা ভাবাবেগের মানুষ নই, ভাবাবেগের লেখকও নই। তবু একটু আগে যা হয়ে গেল তা আমারই অবচেতন মনের পুঞ্জীভূত ক্রোধ আর ক্ষমাহীন আক্রোশের হঠাৎ বিস্ফোরণ ছাড়া আর কিছু নয়। অবন্তীকে কল্পনা করে তার মধ্যে ওটুকু আমারই উত্তপ্ত স্নায়ুর আরোপিত অভিলাষ। · আর, ঊর্মি দত্তকে অমন নৃশংস-ভাবে হত্যা করার পর পল্লব দত্ত ধরা পড়েছে না পালিয়েছে তা-ও আমারই আরোপিত প্রশ্ন। কারণ, এত বড় চমক-লাগানো খবরের দশ ভাগের এক ভাগও এখন পর্যন্ত আমার পড়া হয় নি।

স্নায়ু বশে আনার তাড়নায় আধা-ঠাণ্ডা চা-ই বেশ ধীরে সুস্থে জঠরে চালান দিয়ে পেয়ালাসুদ্ধু ট্রে-টা খাটের নিচে মাটিতে নামিয়ে রাখলাম। তারপর চাঞ্চল্যকর খবর পড়ায় অভ্যস্ত নিস্পৃহতা নিয়েই কাগজে মন দিলাম।

বিশদ বিবরণ পড়তে পড়তে মনে হলো বেশ ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা, যা আমার ধারণা, পল্লব দত্তর দ্বারাই সম্ভব। খবরের দীর্ঘ বিস্তার থেকে সারটুকুই বলি। ···অবন্তিকা গোষ্ঠীর একদা কর্ণধার নটসম্রাট পল্লব দত্ত গত চার মাস যাবৎ অভিনয় জগৎ থেকে একেবারে নিরুদ্দিষ্ট। তার আগের চার মাসের মধ্যেও তিনি হাতে-গোনা কয়েকটি মাত্র নাটকে অভিনয় করেছেন। এ-সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক নীরবতার পর দুই একটা পত্র-পত্রিকার মারফত জনসাধারণকে জানানো হয়েছিল শারীরিক

অসুস্থতা এবং অবসাদের দরুন তাঁর দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছিল। প্রধান পুরুষ-ভূমিকায় পল্লব দত্তর অভাবে অবন্তিকা গোষ্ঠীর কোনো প্রোগ্রামই কখনো ব্যাহত হয় নি। কারণ, এই প্রতিষ্ঠানে তাঁরই হাতে গড়া দক্ষ শিল্পীর অভাব ছিল না। তাঁর জায়গায় অভিনয় করে যে তরুণ শিল্পীটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তাঁর নাম মলয় গুপ্ত। তাছাড়া পল্লব দত্তর রূপসী অভিনেত্রী স্ত্রী সদ্যনিহত নাট্যোর্বশী ঊর্মিমালা জন-প্রিয়তার শীর্ষে। তাঁর তীক্ষ্ণোজ্জ্বল অভিনয়-প্রতিভার গুণে মঞ্চে তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতির দুর্বলতা কখনো প্রকট হয়ে ওঠে নি। এই সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে উত্তরবঙ্গে অবন্তিকার টানা পনেরো দিনের প্রোগ্রাম ছিল। আজই যাত্রার দিন। কিন্তু স্বামীর নৃশংস হত্যার বলি হয়ে গত রাত্রিতেই নাট্যোর্বশী ঊর্মিমালা মহাযাত্রা করলেন।

...'শীতের রাত্রির প্রায় সাড়ে এগারোটায় ওই এলাকার থানায় একটা ফোন আসে। কর্তব্যরত অফিসার সাড়া দিতে অন্য প্রান্ত থেকে খুব ধীর ভারী গলার কথা শোনা যায়, ওমুক রাস্তার অত নম্বর ঠিকানায় একটা মার্ডার হয়েছে—কর্তব্যবোধে পুলিশকে খবরটা জানানো হচ্ছে। তার পরেই ও-প্রান্তের রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ।

'...যে ফোন এলো তার নম্বর কত জেনে নিতে পুলিশ দপ্তরের দু'মিনিটও সময় লাগার কথা নয়। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানা গেল ওই ফোন নম্বর পল্লব দত্ত আর ঊর্মিমালা দত্তর নামে। এই দুটো নাম পুলিশ মহলেরও অপরিচিত নয়। কর্তব্যরত অফিসার তক্ষুনি ওই নম্বর ধরে ফিরে আবার ফোন করলেন। রিং হয়ে গেল। কারো সাড়া পেলেন না। আধ-ঘণ্টার মধ্যেই ওই বাড়ির ঠিকানায় পুলিশের গাড়ি হাজির। রাস্তার ওপরেই বাড়ি। নিচের ঘরগুলো অন্ধকার। দোতলার সব ঘরেই আলো জ্বলছে। কলিং-বেল টিপতে হলো না, নিচের দরজা হাঁ-করা খোলা। আটজনের বাহিনী নিয়ে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে পুলিশ অফিসার দোতলায়

উঠে এলেন। দুই একটা ঘরে উঁকি দিয়ে মনে হলো দোতলায়ও জন-মানব নেই। তারপর তাদের যে প্রশস্ত ঘরে প্রবেশ সেটাই গৃহস্বামী আর গৃহস্বামিনীর শয়নঘর।

'...ঘরে পা দিয়েই অফিসার আর তাঁর দুই সহকারী বিমূঢ়। টেবিলের ওপর মদের বোতল মদের গেলাস। বোতলের অর্ধেকের বেশি খালি। গেলাস প্রায় শূন্য। চেয়ারের গায়ে শিথিল দেহ ঠেস দিয়ে যিনি আয়েস করে বসে আছেন, মুখ দেখলেই বোঝা যায় ওই তরল বস্তু অনেকটাই জঠরে চালান করেছেন। ফর্সা মুখ তেল-তেলে লাল, টানা চোখ ঢুলুঢুলু। পাশেই মস্ত জোড়া খাটে এক রমণীর নিশ্চল দেহ, বিস্রস্ত বসন, মুখে অনেক আঘাতের চিহ্ন, কষ দিয়ে আর নাক দিয়ে তখনো অল্প অল্প রক্ত বেরুচ্ছে। অফিসার আর দুই সহকারী নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে দেখলেন কয়েক পলক। দরকার ছিল না, তবু একজন সন্তর্পণে নাড়ী দেখলেন। মৃত। প্রহরীরা দরজা আগলে দাঁড়িয়ে।

'...অফিসার ঘুরে দাঁড়ালেন। এরই মধ্যে গেলাসে আবার বোতলের জিনিস ঢেলে নেওয়া হয়েছে।

'অফিসারের চিনতে অসুবিধে হয় নি। তবু প্রশ্ন, পল্লব দত্ত... ?

'ভারী টানা গলায় জবাব, ইয়েস সার...

' : থানায় আপনি ফোন করেছিলেন ?

' : ইয়েস সার।

' : তার পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা ফিরে আবার ফোন করেছিলাম, রিং পাননি ?

' : পেয়েছিলাম। ধরি নি।

'(আঙুল দিয়ে খাটের দেহ দেখিয়ে)—ইনি আপনার স্ত্রী ঊর্মিমালা দত্ত নিশ্চয় ?

' : দ্যাট্ বীচ্...ইয়েস। এক চুমুকে গেলাস খালি।

' : কে তাঁকে এ-ভাবে খুন করল ?

' : হোয়াই ··মি !

' : কি করে করলেন ?

' : জাস্ট্ স্ট্র্যাংগল্ড্ হার টু ডেথ। গলা টিপে।

' : কিন্তু মুখেও তো অনেক আঘাতের চিহ্ন ?

' : ও-ভাবে কাবু না করে নিলে সে কি মরার জন্য নিজে থেকে গলা বাড়িয়ে দিত ? টানা স্বরে খুশি জড়ানো জবাব।

'···অফিসার ঘরের চারদিক খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তার মধ্যেই পাঁচ ছবার ক্যামেরার ফ্ল্যাশ বালব্ ঝলসে উঠল। একজন সহকারী নানা দিক থেকে মৃতদেহের ফোটো তুলে নিলেন। একটা বালব্ পল্লব দত্তর মুখেও ঝলসে উঠতে বিরক্ত হয়ে তিনি এবারে আর গেলাসে নয়, বোতলটাই টেনে নিয়ে বাকি তরল পদার্থটুকু গলায় ঢাললেন। শেষ হতে শরীরে একটু ঝংকার তুলে ঠক করে শূন্য বোতলটা টেবিলে নামালেন।

'···অ্যারেস্ট করে আনার পর রাতের মধ্যে তাঁকে আর জেরা করা সম্ভব হয় নি। কারণ ততক্ষণে তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

এরপর বিশ থেকে নাট্যোর্বশীর এই তেত্রিশ বছর বয়সের শুরু পর্যন্ত মঞ্চে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ের প্রশস্তি। পল্লব দত্তর বয়েস এখন সাত-চল্লিশের কাছাকাছি। মাঝের এই সাত আট মাস বাদ দিলে দীর্ঘ বারো বছরের ওপর উর্মিমালা মঞ্চে পল্লব দত্তর বিপরীত নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে এসেছেন।

শেষে কাগজের প্রতিবেদকের সংযোজন, 'বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে গত চার মাস ধরে আর তার আগেও পল্লব দত্তর মঞ্চে অনুপস্থিতির কারণ কোনোরকম শারীরিক, মানসিক বা স্নায়বিক অসুস্থতার কারণে নয়। মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানই তাঁর মঞ্চাভিনয়ের অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। শেষের

দিকে তিনি নাকি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মদ্যপান করতেন। এ-জন্য স্ত্রী অর্থাৎ উর্মিমালার সঙ্গে নিয়ত বিবাদ-বচসা লেগেই ছিল। তাঁদের এই বিবাহের মেয়াদ মাত্র ছ'মাসের।

অবশ্য এ-কথা প্রায় সর্বজনবিদিত এর আগে দীর্ঘকাল ধরে এই জুটি পরস্পরের প্রতি আসক্ত ছিলেন। স্মরণ করা যেতে পারে তাঁদের বিয়ের মাত্র ছ'মাস আগে পল্লব দত্তর প্রথম স্ত্রী অবন্তী দেবী দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। অবন্তী নাম থেকেই 'অবন্তিকা' গোষ্ঠীর উদ্ভব। অবন্তিকার আবির্ভাবের শুরু থেকে প্রায় ছ'বছর পর্যন্ত 'বিদিশা' নামে যে মহিলা নায়ক পল্লব দত্তর বিপরীত নায়িকার ভূমিকায় সফল অভিনয় করে গেছেন—তিনিই পল্লব দত্তর প্রথমা স্ত্রী অবন্তী দত্ত। উর্মিমালা মঞ্চে আসার পর অবন্তী দত্ত তথা অভিনেত্রী বিদিশা লোকচক্ষুর আড়ালে সরে গেছেন। এই প্রতিবেদক বিশ্বস্তসূত্রে জানেন বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন না হলেও অবন্তী দত্ত দীর্ঘকাল ধরে এবং দুর্ঘটনায় মৃত্যুর আগে পর্যন্ত স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। অবন্তী দত্তর অঘটন-মৃত্যুর ছ'মাসের মধ্যে পল্লব দত্তর সঙ্গে উর্মিলার বিবাহ আর আবার ছ'মাসের মধ্যে স্বামীর হাতে তার এমন নৃশংস হত্যার ফলে সুস্থ বিবেচক মানুষের মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, অবন্তী দত্তর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর আড়ালেও কোনো রহস্য থাকা সম্ভব কিনা? অবন্তী দত্তর স্বীকৃতি সত্ত্বেও আজ এমন ঘটনার পর এ-সংশয় থেকেই যায় সত্যিই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু না অমানুষ স্বামীর কারণে আত্মহত্যা। এবারের বিচার-পর্বে ওই দুর্ঘটনার নতুন কিছু আলোকপাত হবে কিনা সেটা ভবিষ্যতে লক্ষণীয়।

খুব সত্যি কথাই লিখেছে। বিচারাধীন আসামীর বিরুদ্ধে এ-ভাবে কটাক্ষপাত করা কিছুটা দুঃসাহসের পরিচয়। তবে আদালত বিধির ঠিক বিরুদ্ধাচারণ একে হয়তো বলা যাবে না, কারণ পুলিশের কাছে আসামী কবুল করেছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নায়ক সে-ই।

তবু এই বিবৃতি পড়ার পর আমার ক্ষোভ অন্য কারণে। সব জানা সত্ত্বেও কোনো কাগজ আট মাস আগে এ-ধরনের কটাক্ষপাত করেনি। কেন করে নি? তখন কি তারা প্রতিভাদীপ্ত নটসম্রাট পল্লব দত্ত আর না-মাতা না-কন্যা না-বধূ নাট্যোর্বশী উর্মিমালার রসাপ্লুত জীবন-প্রহসন স্থূল বিশ্লেষণের যূপকাষ্ঠে এনে ফেলতে চায়নি?

মানবাচরণের আরো নজির দেখলাম পরের কয়েক দিনের কাগজে। বিশেষ করে পরদিনের কাগজে। মঞ্চে কম-বেশি সাত, আট মাসের অনুপস্থিতির ফাঁকে নটসম্রাটের জনপ্রিয়তার মুকুট ধুলায় গড়াগড়ি। এই এক ঘটনার ফলে গণজনের চোখে সে কত বড় ভিলেন তার নজির পরদিনের কাগজের খবর এবং মস্ত ছবি। হাত-কড়া পরা অবস্থায় ভ্যান থেকে নামিয়ে তাকে ম্যাজিস্ট্রেট-কোর্টে নিয়ে যেতে পুলিশের হিমসিম দশা। ভ্যান থেকে তাকে নামানো মাত্র বিশাল জনতার রোষ তার মাথার ওপর ভেঙে পড়েছে। তারা তাকে কোর্টে নিয়ে যেতে দেবে না, বিচার তারাই করবে—আজও মানুষটা কন্দর্পকান্তি, সুপুরুষ—ওই দেহ থেকে বিশাল রুষ্ট জনতা প্রাণটা খুঁড়ে খুবলে বার করে নিতে চায়। কাগজের ছবিতে দেখা যাচ্ছে পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে ওই লোকের ওপর উন্মত্ত জনতার কিলচড় ঘুষি পড়ছে, চারদিক থেকে তার ওপর থুথু বৃষ্টি হচ্ছে। একটা পাথরের ঘায়ে তার কপাল রক্তাক্ত। জনতার দাবি, 'ওকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, আমরাই ওর বিচার করব। পরিস্থিতি সামলানোর দায়ে পুলিশকে লাঠি-চার্জ করতে হয়েছে।

একদিন নয়, পর পর কয়েক দিনের কাগজে একই খবর, জনতার রোষের ছোট-বড় একই ছবি।···সেই পুরনো কথাই আবার মনে হয়েছে। উর্বশী কারো একার সম্পত্তি নয়, তার ওপর জনমানসের অধিকার। সেই অধিকারের রক্ত-মাংসের ঐশ্বর্যকে ওই অপরাধী নির্মমভাবে হত্যা করেছে, চিরতরে বিলুপ্ত করেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট-কোর্ট থেকে কেস সেসনে চালান হতে বেশি সময় লাগে নি। গোড়ায় গোড়ায় সেখানেও জনতার রোষের ছোট-বড় একই দৃশ্য। ...পল্লব দত্তর ভাই কল্লোল বা কালু দত্তও এখন ওই জনতার মতোই হিংস্র উল্লসিত কিনা জানি না। হলেও সেটা নাট্যোর্বশী হত্যার কারণে নয়, তার তুঃখ বেদনা আর হিংস্র আক্রোশের হেতু তার অতিপ্রিয় ভ্রাতৃ-বধূর জীবন যন্ত্রণা এবং অকালমৃত্যু। কালুর বাড়িতে ফোন নেই, অবন্তীর মেয়ে-জামাই আলো-বিকাশের বাড়িতে আছে। বিকাশ বড়লোকের ছেলে, নিজেও কস্ট-অ্যাকাউনটেণ্ট—একটা বড় ফার্মের সঙ্গে যুক্ত। ওদের ফোন নম্বর আমার কাছে আছে। অনেক বার ভেবেছি আলোকে একটা ফোন করব কিনা। করি নি, মনে হয়েছে ফোন একটা ওরই আমাকে করার কথা।...ঘৃণায় লজ্জায় হয়তো মুখ লুকিয়ে থাকতে পারলে বাঁচে। ফোন করে ওকে আমি বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলি কেন? তাছাড়া ওর মায়ের জন্মকাল থেকেই আমার যেমন স্নেহের সম্পর্ক, দাত্ন বলে থাকলেও ওর মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কটা নিবিড় হবার সুযোগ আদৌ হয় নি। আলো একটু বড় হয়ে ওঠার পর থেকে অবন্তী অনেকগুলো বছর নিঃশব্দ অভিমান বুকে নিয়ে পরিচিত লোকচক্ষুর আড়ালে কাটিয়েছে। তখন তার সঙ্গেও আমার দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ কমই হয়েছে।

আলোকে ফোন না করলেও করার ইচ্ছে হয়েছিল কারণ, অবন্তীকে নিয়ে আমার তুটো কৌতূহলের নিবৃত্তি আজও হয়নি। এক, মৃত্যুর আগে অবন্তী মেয়ে জামাইকে কি চিঠি লিখেছিল যা তার তুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর পল্লব দত্তর বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করা যেত—আর কালু দত্ত তাই করতেও চেয়েছিল। তুই, মৃত্যুর আগে অবন্তী তার মেয়েকে কি বলে গেছল, তার মধ্যে সেই অন্তিম সময়েও আলো কি এমন বিশ্বাসের জোর দেখেছিল যা শুনে আর দেখে ওই মেয়ে তার বাবাকে অত প্ররোচনা সত্ত্বেও পুলিশের টানা-হেঁচড়ার মধ্যে টেনে আনতে চায় নি? আলো

বলেছিল, ফোনে নয়, সময়ে সব আমাকে বলবে। আজও বলে নি। সময় অনেক কিছু ভোলায়, অনেক ক্ষত জুড়ে দেয়। হয়তো তাই হয়েছে।

পল্লব দত্তর সেসনের বিচার-পর্ব কাগজে যতটুকু বেরায় আমি খুঁটিয়ে পড়ি—পড়ছি। পল্লব দত্ত নিজের স্বপক্ষে কোনো উকীল দিতে চায় নি, দেয়ও নি। কিন্তু এই অপরাধের বিচার একতরফা হয় না। আসামীর পক্ষ নিয়ে কাউকে সওয়ালে দাঁড়াতেই হয়। নিরপেক্ষ বিচারের দায়ে এই রকমই রীতি। আসামী আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উকীল না দিলে স্টেট দেবে। সরকার নিযুক্ত উকীল আসামী পক্ষের হয়ে সওয়াল করবে, লড়াই করবে।

সেই ব্যবস্থাই হয়েছে।

···সরকার নিযুক্ত আসামী পক্ষের উকীলটিকে যে কারণেই হোক, বিচক্ষণ আর কিছুটা হৃদয়বান মনে হয়েছে আমার।

শুরুতেই বিচারক আসামীকে আনুষ্ঠানিক প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার বিরুদ্ধে এই-এই অভিযোগ, আপনি দোষী কি নির্দোষ—আর ইউ গিল্টি অর নট্?

আসামীর ঠাণ্ডা জবাব, আমি একটি হত্যার জন্য দায়ী—আই অ্যাম গিল্টি অফ ওয়ান মার্ডার।

জবাবটা সকলের কানেই হেঁয়ালির মতো ঠেকেছিল। এমন কি কাগজে পড়ে আমারও।···আর এই জবাব শোনা-মাত্র আসামী পক্ষের উকীল চটপট উঠে দাঁড়িয়ে তাকে জিগ্যেস করেছেন, হোয়ট ডু ইউ মীন? ইউ মীন দিস্ পার্টিকিউলার মার্ডার অফ ইওর ওয়াইফ উর্মিমালা দত্ত?

বিপক্ষ উকীলের তরফ থেকে সঙ্গে সঙ্গে বাধা পড়েছে।—কোয়েশ্চেন ইররেলিভেন্ট অ্যাণ্ড ইম্‌মেটিরিয়াল, এই একটি মার্ডারই আমাদের ইস্যু।

স্বপক্ষের উকীলের সঙ্গে আসামীরই কোনোরকম সহযোগিতা নেই। তবু তিনি যথাসাধ্য লড়তে চেষ্টা করেছেন। লড়াইয়ের ছিদ্র খবরের কাগজ

এবং পুলিশই নিজের অগোচরে যুগিয়েছে। পুলিশ হত্যার মোটিভ খুঁজতে গিয়ে পল্লব দত্তর বাড়ির পুরনো চাকর আধ-বয়সী প্রহ্লাদকে থানায় এনে জেরা করেছে। ওই বাসগৃহে কারা আসত, কে বেশি আসত। সে বিশেষ করে একটি নামই করেছে। প্রায়ই আসত অবন্তিকার বর্তমান নায়ক মলয় গুপ্ত। সেই সূত্র ধরে সরকার নিযুক্ত আসামী পক্ষের উকীল প্রহ্লাদ এবং পরে মলয় গুপ্তকেও থানায় টেনে এনেছেন। তার জেরায় জেরায় প্রহ্লাদের অবস্থা জেরবার। সে স্বীকার করেছে মলয় গুপ্ত প্রায়ই রাতের দিকে তাদের বাড়িতে আসত। কতক্ষণ থাকত সে জানে না, কারণ রাত ন'টায় তার ছুটি হয়ে যেত। বাড়ির কাছেই এক বস্তিতে পরিবার আর ছেলে-মেয়ে নিয়ে তার বাস। ভোর থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত তার কাজ। তবে শো থাকলে রাত বারোটার আগে তার ছুটি হতো না, আর নাটক করার জন্য কর্ত্রী বাইরে গেলেও তাকেই বাড়ি পাহারা দিতে হতো। আর তার মনিব কলকাতায় থাকলে বেশি রাতে বাড়ি ফিরত— অনেক রাতে ফিরতও না।...হ্যাঁ, সেই হত্যার রাতেও মলয় গুপ্ত এসেছিল এবং সে ফিরে যাবার আগেই তার ছুটি হয়ে গেছল। কাজেই ঘটনা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। কিন্তু জেরায় তাকে স্বীকার করতে হয়েছে, বাড়িতে এলে মলয় গুপ্ত মনিব-মনিবানির শয়নঘরেই বসত—বাইরের বসার ঘরে নয়। ঘটনার রাতেও সে তাকে শয়নঘরেই দেখেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আসামী পক্ষের উকীলের নগ্ন প্রশ্ন, মলয় গুপ্তর শয়নঘরে থাকাকালীন সে কখনো ওই ঘরে প্রবেশের দরজা বন্ধ দেখেছে কিনা।

প্রতিবাদী পক্ষের আপত্তি সত্ত্বেও বিচারকের হুকুমে সাক্ষী প্রহ্লাদকে জবাব দিতে হয়েছে। সে বিড়ম্বিত মুখে জবাব দিয়েছে, মলয় গুপ্ত থাকা-কালে সে কখনো দরজা বন্ধ দেখে নি।

আসামী পক্ষের উকীলের এ-রকম জেরার উদ্দেশ্য পাঠক হয়তো বুঝতে পারছেন। তাঁর চেষ্টা কেসটাকে তিনশ দুই ধারা অর্থাৎ পূর্বপরিকল্পিত

হত্যা থেকে তিন'শ চার ধারায় অর্থাৎ হঠাৎ উত্তেজনার বশে হত্যার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া। হাতে-নাতে কোনো ব্যভিচার ধরার ফলেই হঠাৎ-আক্রোশে স্বামী যদি স্ত্রীকে খুন করে থাকেন—তাহলে বিচারে তাঁর আর যা-ই হোক ফাঁসি হবে না। জেরায় সকলের, এমন কি বিচারকেরও উৎসুক হবার মতো আর একটা কথা প্রহ্লাদ ব্যক্ত করে ফেলেছে। সে বা তার নিহত কর্ত্রীও জানতো, ঘটনার আগের দিন মনিব হু'সপ্তাহের জন্য পুরী চলে গেছে—তিনি যে কলকাতাতেই ছিলেন এ কেউ জানতই না। প্রহ্লাদের ধারণা কর্ত্রীও জানতেন না। তাই আগের দিন রাতে মনিব পুরী রওনা হয়ে যাবার পর পরদিন রাতে তাঁরই হাতে কর্ত্রীর এই হত্যার কথা শুনে প্রহ্লাদ দশ গুণ অবাক হয়েছে। আগের রাতে প্রহ্লাদ নিজে সঙ্গে গিয়ে মনিবকে পুরীর গাড়িতে তুলে দিয়ে এসেছিল।

এর পর মলয় গুপ্তকেও কোর্টে টেনে এনে আসামী পক্ষের উকীল জেরায় জেরায় তাকে কোণঠাসা করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে ওই মঞ্চাভিনয়ের মতোই স্মার্ট মিষ্টি অথচ বেদনাকাতর। জেরার ইঙ্গিত বুঝে সে মর্মাহত। তার বক্তব্য, ওই আসামীর কাঠ-গড়ায় যিনি দাঁড়িয়ে তিনি তার গুরু। তাঁর কাছেই তার অভিনয় শিক্ষা। সেই সুবাদে নিহত ঊর্মিমালা তার চোখে গুরু-পত্নী। বয়েসেও তিনি তার থেকে হু'তিন বছরের বড়। তাকে ছোট ভাইয়ের মতোই ভালোবসতেন, তাঁর ছোট ভাইয়ের মতোই ও-বাড়িতে তার যাতায়াত। তার বেলায় শোবার ঘর বসার ঘরের কোনো তারতম্য ছিল না। পরদিন হু' সপ্তাহের প্রোগ্রাম নিয়ে তাদের উত্তর বাংলায় রওনা হবার দিন ধার্য ছিল। ঘটনার রাতে সেই সম্পর্কে 'ঊর্মিদি'র সঙ্গে আলোচনা করার জন্য সে এসেছিল।...হ্যাঁ, সে-ও জানত, গুরু পল্লব দত্ত আগের রাতে পুরী চলে গেছেন। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ সে চলে গেছে—পরের ঘটনা সে পরদিন কাগজে দেখেছে।

সমর্থক উকীলের সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন : প্রহ্লাদ তো রাতে থাকে না,

আপনি চলে যাবার পরে নিচের দরজা কে বন্ধ করে? ঘটনার দিনে আপনি চলে যাবার পর নিচের দরজা কে বন্ধ করেছিল?

: প্রহ্লাদ না থাকলে উর্মিদিই বন্ধ করেন, সেই রাতেও তিনিই বন্ধ করেছিলেন।

পরের জেরা আরো তীক্ষ্ণ।—সেই রাতে আপনি কখন চলে গেছলেন?

: রাত দশটার কিছু পরে।

: কত পরে?

: আধ-ঘণ্টার মতো হতে পারে।

: তখন পল্লব দত্তর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি?

: তাহলে বুঝতে হবে পল্লব দত্তকে উর্মিমালাই দরজা খুলে দিয়েছিলেন …কিন্তু বাইরের দরজা খোলা রেখেই দুজনে ওপরে উঠে এসেছিলেন? কারণ, পুলিশ এসে বাইরের দরজা হাঁ-করা খোলা দেখেছে…

: সে-সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই…

এ-জায়গায় কোর্ট-রিপোর্টারের মন্তব্য, শেষের এই প্রশ্নোত্তরের সময় তার মনে হয়েছিল মঞ্চের স্মার্ট অভিনেতা একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তিনি একবারও তাঁর গুরু আসামীর কাঠগড়ার দিকে তাকান নি, কিন্তু আসামী পল্লব দত্ত সারাক্ষণই তাঁর দিকে চেয়ে একটু মুচকি মুচকি হাসছিলেন।

প্রতিবাদী উকীলের উপরোক্ত জেরা সরাসরি নাকচের চেষ্টা।—এ-সব প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক এবং কেসকে জটিল করে তোলার চেষ্টা।…আসামী পুলিশকে নিজেই ফোন করেছিলেন, তারা আসছে ধরে নিয়ে তিনিই বাইরের দরজা খুলে রেখে আসতে পারেন।

যাক, শেষ পর্যন্ত এই বিচারের ফলও যা আশা করা গেছল তাই। ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিত এবং নৃশংসভাবে স্ত্রী উর্মিমালা দত্তকে হত্যার দায়ে বিচারক আসামী পল্লব দত্তর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন।

এর পর রীতি অনুযায়ী এই বিচারপর্ব এবং দণ্ড ঘোষণা হাইকোর্টের বিশ্লেষণ এবং অনুমোদন সাপেক্ষ। সেসনের বিচারপর্বে আসামীর আচরণ দেখে স্পষ্টই বোঝা গেছে এই বিচারের বিরুদ্ধে সে হাইকোর্টে অ্যাপিল করবে না। সে এই দণ্ডই মেনে নেবে।

হাইকোর্টের শেষ ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত কতদিন বা ক'মাসের মধ্যে শোনা যাবে আমার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত অস্বস্তিতে আমার ভিতরটা ছেয়ে যাচ্ছে। পল্লব দত্তর নির্মম শাস্তিই প্রাপ্য এ-সম্পর্কে আমিও দ্বি-মত নই। কিন্তু চার মাস আগে কাগজে ঊর্মিমালা হত্যার খবর পড়েই আমারও শরীরের রক্তের কণায় কণায় যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, একটু একটু করে সেগুলো যেন একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, দণ্ড-ঘোষণার পর থেকে আমি উল্টে কি-রকম অস্বস্তি বোধ করেছি, করছি। পল্লব দত্ত যদি নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রাণপণে যুঝত, বাঁচার তাড়নায় অভিনেত্রী স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী প্রমাণ করার চেষ্টায় কোর্টে আর এক নাটকের ঝড় তোলার পরে এই দণ্ডই পেত—তাহলেও হয়তো আমার উষ্মা কমত না, ভিতরটা এ-রকম ঠাণ্ডা মেরে যেত না।

···কিন্তু এটা কি-রকম হলো? ঊর্মিমালাকে সে খুব ঠাণ্ডা মাথায় নৃশংস-ভাবে হত্যা করেছে। কিন্তু তারপর সে পালাবার চেষ্টা করল না। অথচ পালানোটাই তার দিক থেকে খুব সহজ ছিল, কারণ, সকলেই জানত আগের রাতে সে পুরী চলে গেছে, কলকাতাতেই নেই। প্রহ্লাদ নিজে গিয়ে তাকে পুরীর গাড়িতে তুলে দিয়ে এসেছিল।·· পরিকল্পিত হত্যা যখন, নিজেকে বাঁচাতে হলে অনায়াসে আরো দু'দিন আগে পুরী রওনা হয়ে যেতে পারত। সেখানকার কোনো হোটেলে নাম লিখিয়ে ঘর নিয়ে চুপচাপ ফিরে এসে এ-কাজ করে অনায়াসে সকলের অগোচরে সে আবার পুরী ফিরে যেতে পারত। পুরী সে নিশ্চয়ই যায় নি, দুই এক

স্টেশন পরেই নেমে হয়তো আবার কলকাতায় ফিরেছে। রাতটা কোথাও কাটিয়ে পরের রাতে এসেছে। যতদূর সম্ভব নৃশংসভাবে উর্মিমালাকে হত্যা করেছে। তারপর নিজেই থানায় ফোন করে খবর দিয়েছে। তারপর মদের বোতল গেলাস নিয়ে বসেছে।

…অর্থাৎ ধরা দেবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই সে এ কাজ করেছে।

…কোর্টের বিচারেও তারই অসহযোগিতা সব থেকে বেশি।

· সব শেষে এই নির্মম দণ্ড যেন দু'হাত বাড়িয়ে ফুলের মালার মতো নিয়ে নিজের গলায় পরেছে।

আমি কেবল ভেবে পাচ্ছি না, এমন এক মদ্যপ হৃদয়শূন্য মানুষ হঠাৎ নিজের জীবন সম্পর্কে এমন নির্লিপ্ত, এত নিরাসক্ত, এমন নিস্পৃহ হতে পারে কি করে!

বাড়ির দরজায় একটা মার্ক-থ্রি অ্যামবাসাডার গাড়ি এসে দাঁড়ালো। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে গাড়ি থেকে কারা নামছে দেখা মাত্র আমি নিশ্চল কয়েক মুহূর্ত।

সামনে থেকে নামতে দেখলাম পল্লব দত্তর ভাই কালু দত্তকে। পিছন থেকে অবন্তীর মেয়ে আলো আর তার স্বামী বিকাশকে। তিনজনেরই শুকনো বিবর্ণ পাংশু মুখ। আলোকে একপলক দেখে আরো মনে হয়েছে ও অন্তঃসত্ত্বা। ভারী মাস।

আমি সিঁড়ির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। একটু বাদে ওরা ওপরে উঠে এলো। কান্নায় ভেঙে পড়ে আলো দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, এ কি হলো—এ কি হয়ে গেল দাদু—মায়ের শেষ আশা শেষ বিশ্বাসটুকুও যে একেবারে ভেঙে গেল—মায়ের মৃত্যু যে ব্যর্থই হয়ে গেল দাদু!

ওকে ধরে এনে বসালাম। কালু আর বিকাশকে বসতে ইশারা করে পাশে বসে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আলোকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করলাম।

একটু বাদে আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে আলো ধরা গলায় আবার বলল, মায়ের সেই শেষ বিশ্বাসটুকু আমিও মনে মনে জপ করতাম দাদু, কিন্তু বাবা শেষ পর্যন্ত এ কি করল! আমি যে এখনো ভাবতে পারছি না মায়ের বিশ্বাস সত্যি হবে না!

কি জবাব দেব···সান্ত্বনাই বা কি দেব?

একটু চুপ করে থেকে বিকাশকে জিগ্যেস করলাম, শেষ চিঠিতে তোমার শাশুড়ী তোমাদের কি লিখে গেছলেন?

জবাব না দিয়ে বিকাশ পকেট থেকে একটা পুরনো খাম বার করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। খামের ওপরে মুক্তোর অক্ষরে বিকাশের নাম-ঠিকানা লেখা। খাম থেকে চিঠি বার করে খুললাম। অবন্তীর বাংলা লেখা আরো সুন্দর। চিঠির মাথায় লেখা, ঈশ্বর সহায়। তারপরেই ডান দিকে চিঠির তারিখের দিকে চোখ গেল আমার। আমার স্পষ্ট মনে আছে, অবন্তীর দুর্ঘটনার তারিখেই লেখা এই চিঠি।

'স্নেহের বিকাশ, আলো,

প্রথমেই তোমরা আমার প্রাণ-ঢালা আশীর্বাদ নিও। আশীর্বাদ করার সুযোগ ঈশ্বর আর কত দিন দেবেন জানি না।

বিকাশ, আমাকে নিয়ে তোমার দাদা-বৌদিদের সঙ্গে তোমার অশান্তি চলছে আমি জানি। উত্ত্যক্ত হয়ে তুমি আলাদা বাড়ি খুঁজছ আলো তা-ও আমাকে বলেছে। তাঁদের অভিযোগ, কেন আমি নিজের পাঁচ ছ' বছরের অভিনয় জীবনের কথা গোপন করেছি। আর আমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে কেন আমি অমন পাষণ্ড স্বামীকে ডিভোর্স করছি না। তাঁদের অপরাধ নেই, এমন কথা তাঁরা তুলতেই পারেন।···বিকাশ, তুমি আমার কথা বিশ্বাস কোরো, লজ্জায় ঘৃণায় আমার ছ' বছরের অভিনেত্রী জীবন আমি অন্তরাত্মা থেকে ছেঁটে দিয়েছিলাম। না, অভিনেত্রী জীবনকে আজও আমি এতটুকু লজ্জার

বা অগৌরবের জীবন বলে মনে করি না। আমার লজ্জা আর ঘৃণা শুধু নিজের স্বামীকে বিপথগামী হতে দেখে। কিন্তু তিনি যে প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেতা এ তোমরা সকলেই জানতে, আর তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে সুস্থ নয়, এ জেনেও পুরুষ ছেলের মতোই তুমি আলোকে নিয়েছিলে। আমি বলছি, তুমি ভুল করোনি, মেয়ের নামে শপথ করেই বলছি, আজ পর্যন্ত কোনো পাপের ছায়াও আমাকে বা আলোকে স্পর্শ করে নি। ওকে কেবল তুমি দুঃখিনী মায়ের মেয়ে বলে জেনো, এটুকুই ওর দুর্ভাগ্য। এজন্য কোনো অসম্মান বা অনাদার ওর প্রাপ্য নয়।

আলো, তুই শিবের মতো স্বামী পেয়েছিস। শ্বশুরবাড়ির লোকের মুখে যদি কোনো কটু কথা শুনতেও হয়, বিকাশের ওপর বিশ্বাস রেখে আর তার মুখ চেয়ে হাসিমুখে তা সহ্য করবি। এখনকার এই কালো ছায়া দু'দিনেই কেটে যাবে দেখিস।

বিকাশ, আলো, তোমাদের সঙ্গে আর কতদিন বা আদৌ আর দেখা হবে কিনা জানি না। বিশ্বাসের জোরে সীতাকেও অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। ক'দিন ধরে—আলো, তোর সেই বিয়ের দিন থেকেই—আমিও অনবরত এমনি এক বিশ্বাসের কঠিন পরীক্ষার হাতছানি দেখছি। আলো, তোর বাবা, বিকাশ—তোমার শ্বশুর শেষ পর্যন্ত অমানুষই থেকে যায় কিনা—সেই অগ্নিপরীক্ষায় তাকে আমি ফেলব। তার মানুষের চেহারাও আমি দেখেছি, যা খুব বেশি লোক দেখে নি—তাকে সেই চেহারায় ফিরিয়ে আনার জন্য যে মাশুলই দিতে হোক, এই পরীক্ষায় আমাকে নামতে হবে।

বিকাশ-আলো, আমার আর একটা অনুরোধ তোমরা রেখো। আদেশও বলতে পারো। এ-চিঠি যেন কোনো কারণেই কখনো তৃতীয় কারো হাতে না পড়ে। আর একটা কথা তোমরা দুজনেই

মনে রেখো, পৃথিবীতে যা ঘটে স্থির চিত্তে তা মেনে নিতে পারাটাই সব থেকে বড় শক্তি। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন'।

তোমাদের মা অবন্তী

চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরে বিকাশকে ফেরত দিতে গেলে সে বলল, ওটা আপাতত আপনার কাছে রাখুন, কারণ আছে।
এ-চিঠি আমার কাছে রাখার কি কারণ থাকতে পারে ভেবে পেলাম না। চিঠিটা হাতে রেখেই আলোকে জিগ্যেস করলাম, শেষ বার জ্ঞান ফিরতে তোর মা তোকে কি বলেছিল?
চিঠিটা পড়ার পর যা আশা করেছিলাম, তাই।...মায়ের মুখের সঙ্গে কান লাগিয়ে আলোকে বুঝতে হয়েছিল মা কি বলতে চায়। বলেছিল, ওর বাবাকে ফেরানোর জন্য এই মৃত্যুর তার খুব দরকার ছিল। আলোর বিয়ের দিন সকালে ওর বাবার সঙ্গের একজনের কপালে সিঁথিতে সিঁদুর দেখেই এই সংকল্প ওর মায়ের মনে এসেছিল। মা জানত, ওটা বিয়ে নয়, ফাঁদ—শেকল আর ফাঁকি (আলোর এ-কথাগুলোর তাৎপর্য আমার ঠিক বোধগম্য হয় নি, তবু বাধা না দিয়ে শুনে গেছি)। মায়ের সংকল্প, শেকল ভেঙে ওই ফাঁদ আর ফাঁকি থেকে আলোর বাবাকে বার করে আনতেই হবে। আলো জানালো মায়ের কথা বলতে তখন খুব কষ্ট হচ্ছিল, আর বেশির ভাগ কথাই ছাড়া-ছাড়া অসংলগ্ন লাগছিল। কিন্তু শেষের কিছু কথা খুব স্পষ্ট। বলেছিল, আমি জানি তোর বাবার সবটাই অমানুষ, তাকে ফিরতেই হবে...সে না ফিরে পারে না। আমার জন্য তোরা তাকে কোনোরকম বিপদের মধ্যে ফেলতে চেষ্টা করবি না, তোর কাকাকে ঠাণ্ডা রাখবি—তাকে পুলিশের টানা-হেঁচড়ার মধ্যে যেতে দিবি না—তাহলে আমার সব চেষ্টা সব বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে—আমার আত্মা ওপর থেকে দেখবে...যা বলে গেলাম তার নড়চড় করবি না। সে ফিরবে, তার কোনো

অনিষ্ট কামনা করবি না।

আলো আবারও কেঁদে ফেলেছিল। কিন্তু চোখ মুছে এর পর যা বলল, শুনে আমি বিষম অবাক। বলল, দাদু, আমাদের শেষ অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে···একবারটি গিয়ে তোমাকে বাবার সঙ্গে দেখা করতেই হবে···এটা আমাদের নয়, বাবার ইচ্ছে, তার বিশেষ অনুরোধ একবারটি তুমি যদি দয়া করে তার সঙ্গে দেখা করো।

আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম।—তোর বাবা আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে!

: হ্যাঁ দাদু, আমরা কত চেষ্টা করে বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম, কিন্তু আমাদের সঙ্গে বাবা দেখা করতে চাইলো না। জেল দপ্তর থেকে চিঠি পেলাম, কারো সঙ্গে তার দেখা করার ইচ্ছে নেই, কেবল তোমার নাম করে বলেছেন, ওমুক ঠিকানার ওমুক যদি দয়া করে তার সঙ্গে একবার দেখা করেন তাহলে বাবা কৃতজ্ঞ থাকবে।

এই শোনার পরেও আমি বিমূঢ় হতভম্ব।

···উঠতি বয়েস থেকেই ওই ছেলে জানে তার ওপর আমার কত বিতৃষ্ণা। বাড়ির বাইরে অবন্তীর সঙ্গে ওর বিয়ের ব্যাপারে কেউ যদি সক্রিয়ভাবে বাধা দিয়ে থাকে—সে আমি। ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেও ওই বিয়ে আমি বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিলাম। এ-ও জানে, তার আগে যত-ভাবে পারি আমি অবন্তীর কান বিষিয়েছিলাম। বিয়ের পরে বাইরের আচরণে অবশ্য আমার ওপর কোনোরকম রাগ বা বিদ্বেষ দেখায় নি। সেটুকু অবন্তীর কারণে বলেই জানি। বিয়ের প্রায় দেড় মাস পরে বম্বে থেকে ফিরে ওরা যখন যুগলে দেখা করতে আসে, পল্লব আগে বাড়িতে ঢোকে নি। অবন্তী প্রণাম সেরে খুব হেসে বলেছিল, তোমাদের জামাই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে, ভিতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না।

ব্যস্ত হয়ে ডাকতে গেলে হাসিমুখেই কথা শুনিয়েছিল, অবন্তী সাহস

দেওয়া সত্ত্বেও ঘাড়ধাক্কা খাবার ভয়ে সাহস হচ্ছিল না…

আমিও বলেছিলাম, জামাই যখন হয়েই বসেছ, এখন ঘাড়ধাক্কা দিলে নিজেদের মেয়েকেই কষ্ট দেওয়া হবে, এসো।

…আর পরেও অবন্তী আমার কোনো উপন্যাস নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য উৎসুক হলে পল্লব খুব বিনীত ভাবেই পাশ কাটাত। বলত, অত সাহস আমার নেই, জাত-লেখকের গায়ে এতটুকু দাগ পড়লে তখন তুমিসুদ্ধু শত্রু হয়ে উঠবে—আমাদের হলো গিয়ে হেঁজি-পেঁজি লেখক নিয়ে কারবার, নিজেদের ইচ্ছেমতো কাট-ছাঁট করে নাটক বানিয়ে নিশ্চিন্ত।

মোট কথা, ওদের বিয়ের পরেও এই ছেলেকে আমি খুব একটা পছন্দ করতাম না। আর ধারণা, সে-ও আমাকে আপনার জনের মতো দেখত না। অবশ্য আমার ওপর তার স্ত্রীর ভক্তিশ্রদ্ধার মাত্রাটা ভালোই জানত, আর কেবল সেই কারণেই মুখোমুখি হলে এই ছেলেও বিনীত।

অবন্তীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পরে আমার ক্রোধের আভাস সে একাধিকবার পেয়েছে। আর অবন্তীর ওই দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর আমার মনের অগ্নিগর্ভ অবস্থাটা ওই লোকের আঁচ করতে না পারার কথা নয়।

ফাঁসির আসামী হবার পর সে কেবল আমার সঙ্গেই দেখা করতে চায় শুনলে বিমূঢ় হব না তো কি!

এর পর কালুই আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ভেঙে বলল, শেষে আলো আর বিকাশও যোগ দিল।…কাগজে ঊর্মিমালার হত্যার খবর পড়ে কালু খুশি না হয়ে পারে নি। বউদির সমস্ত যন্ত্রণার মূলে যে মেয়ে এ-রকম নিষ্ঠুর শাস্তিই তার প্রাপ্য ভেবেছে। আর একই সঙ্গে তার স্কাউণ্ড্রেল দাদারও পাপের হিসেব দেবার অমোঘ সময় ঘনিয়ে এলো ভেবে অখুশি হয় নি। কিন্তু আলো এসে কান্নায় ভেঙে পড়তে তার তপ্ত মস্তিষ্কে নাড়া-চাড়া পড়ল। ওর বাবার জন্য দুঃখ নয়, বাবার কি হবে সেই আতঙ্ক নয়, ওর এত কান্না মায়ের জন্য। মায়ের এত বিশ্বাসের আর দাম কি থাকল,

তার আত্মাহুতি যে একেবারে ব্যর্থই হয়ে গেল।

সেই প্রথম মায়ের শেষ চিঠি আলো কাকুর হাতে দিল। আর শেষ বার জ্ঞান হতে মা ওকে কত বড় বিশ্বাস বুকে ধরতে বলে গেছল তাও বলল। সেই চিঠি পড়ে আর কথা শুনে কালুর ভিতরেও নাড়াচাড়া পড়ল এক-প্রস্থ। বউদি একটু ভাবপ্রবণ মেয়ে বটে, কিন্তু তার যেমন সাহস তেমনি বুদ্ধি আর তেমনি গোঁ। বোকার মতো কোনো বিশ্বাসকে বুকে আঁকড়ে ধরার মানুষই নয় সে। তার ভিতরের কোনো প্রখর অনুভূতিই তাকে বিশ্বাসের দিকে টেনে নিয়ে যেত। সেই বিশ্বাস কালু খুব একটা দেখে নি, সব থেকে বেশি দেখেছে আলোর বিয়ের সময়। যা বলেছে, যা আশা কবেছে, তা-ই হয়েছে। আগে বা পরেও ভিতরের এই অনুভূতি থেকে যখন যা ভবিষ্যৎবাণী করেছে তারও খুব একটা রকমফের হয় নি।

···এর পর আমার মতো ওরাও ভাবতে বসেছে। মানুষটার এই আচরণ কেন! খুব ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে, কিন্তু সুযোগ পেয়েও পালাতে চেষ্টা করে নি। নিজে পুলিশকে ফোন করেছে, ধরা দিয়েছে। অনেক জেরা করেও খুনের কৈফিয়ত আদায় করতে পারে নি, কেবল বলেছে তার বিবেচনায় বেঁচে থাকার অধিকার নেই বলেই হত্যা করেছে। মাথা উঁচিয়েই জনতার রোষের মুখোমুখি হয়েছে। পুলিশের বেষ্টনি ভেঙে তার গায়ে মাথায় জনতার কিল চড় ঘুঁষি পড়েছে, তাদের থুথুতে মুখ ভিজে গেছে। ওই পরিস্থিতিতেই যে-কোনো কঠিন মানুষেরও ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ওই লোক স্থির, শান্ত অনবনত। · কাকুকে না জানিয়ে আলো আর বিকাশ তার জন্য একজন নামী অ্যাডভোকেট ঠিক করে কথা-বার্তা বলার জন্য জেলে ওই লোকের কাছে পাঠিয়েছিল। সে তাকে বাতিল করে দিয়েছে, বলেছে দরকার নেই। কোর্টেও তাই বলেছে, এককথায় অপরাধ স্বীকার করে বিচারের নিষ্পত্তি চেয়েছে। রীতি অনুযায়ী উকীল দিতে ওই মানুষই তার সঙ্গে সব থেকে বেশি অসহযোগিতা

করেছে।

···না, তার তরফ থেকে আত্মরক্ষার এতটুকু চেষ্টার আভাসও মেলে নি। ভোগাসক্ত মানুষটার এই বিচিত্র আচরণ দেখে আলো আর বিকাশ তো বটেই, কালুরও তার দাদার সম্পর্কে আবার নতুন করে ভাবতে হয়েছে। তিনজনে পরামর্শ করে বিধিগত ভাবে জেলে তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি সংগ্রহ করেছে। মেয়ের এখনো আশা হাইকোর্টের বিচারের ব্যাপারে বাবাকে যদি রাজি করানো যায়, মায়ের মৃত্যু হয়তো ব্যর্থ হবে না, অ্যাপিলে মৃত্যুদণ্ডকে যদি কারাদণ্ডের দিকে ফেরান যায় তাহলে মায়ের বিশ্বাস আর ভবিষ্যদ্বাণী একদিন না একদিন সত্যি হতেও পারে।

···কিন্তু বাবা তাদের সঙ্গে দেখাই করল না। জেল কর্তৃপক্ষের মারফত কেবল বলে পাঠালো, কারো সঙ্গে তার দেখা করার ইচ্ছে নেই, প্রয়োজনও নেই। কেবল আমার নাম করে বলেছে, উনি যদি দয়া করে একবার দেখা করেন তাহলে সে কৃতজ্ঞ থাকবে।

আলো আর বিকাশ পুলিশ অথরিটি থেকে আমার দেখা করার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে। সেটা হাতে নিয়ে দেখলাম, আরো তিন দিন পরের তারিখে সকাল নটায় সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট হয়েছে।

—তোমাকে যেতেই হবে কাকু, আর বাবাকে অ্যাপিল করতে রাজি করাতেই হবে। মায়ের শেষ চিঠি সঙ্গে এনেছি, দরকার বুঝলে ওটা দেখিয়ে বাবাকে তুমি রাজি করাতে চেষ্টা করবে।

নিজের মন থেকেই বুঝতে পারছি আলো বা ওরা যা চাইছে তা হবে না। এই উদ্দেশ্য নিয়ে পল্লব আমাকে কখনোই ডাকেনি, ডাকতে পারে না। আমি অনুরোধ করলেও হাইকোর্টে অ্যাপিল করে আবার এক বিচারপর্বের মুখোমুখি হতে সে রাজি হবে না। তার আমাকে ডাকার উদ্দেশ্য অন্য কিছু। কি হতে পারে তা অবশ্য কল্পনাও করতে পারছি না। কিন্তু দেখা করে আমি ফিরে আসার পর আশাহত হলে এই ভারী মাসে মানসিক

যন্ত্রণার ফলে আলোর বিশেষ ক্ষতি হবে। কি মনে হতে বিকাশকে জিগ্যেস করলাম, ওর ছেলেপুলে হবার এক্সপেকটেড ডেট্ কবে?

বিষণ্ণ পরিবেশে হঠাৎ এই প্রশ্ন কেউ আশা করে নি। বিকাশ মৃদু জবাব দিল, সামনের মাসের মাঝামাঝি।

আমি মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। হাইকোর্টের অনুমোদন বা সিদ্ধান্ত এত শীগগির না আসাই সম্ভব। হতাশা কাটিয়ে আলোর মনে একটু জোর আনার জন্য এবার নিজের বিদ্যেবুদ্ধি আর বিবেচনার আশ্রয় নিলাম।—শোন্ আলো, যে আসছে তার মুখ চেয়ে এ-সময় তোর বেশি উত্তেজনা বা বেশি মানসিক যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে কাটানো ঠিক নয়। তাছাড়া তোর এত ভেঙে পড়ার কি হলো, তোর বাবা অ্যাপিলে যেতে চাইলেও তুই যা আশা করছিস তা-ই হতে পারে। সেসনের ক'টা মৃত্যুদণ্ড হাইকোর্ট পর্যন্ত গিয়ে বহাল থাকে। সেখানে দু-দু'জন অভিজ্ঞ জজের ডিভিসন বেঞ্চ সমস্ত ব্যাপারটা খতিয়ে দেখবে চুল-চেরা বিশ্লেষণ করবে। তোর বাবা কত বড় আর্টিস্ট ছিল এ তাঁরাও জানেন। হত্যা করে সেই লোক পালানোর সুযোগ থাকতেও নিজে ধরা দিল, এত বড় বিচারে নিজের উকীল দিল না, একটি বারের জন্য আত্মরক্ষার চেষ্টা করল না —এ কি তাঁরা দেখবেন না, ভাববেন না? তাঁরা কি ভাববেন না নিহতর সম্পর্কে তেমন কিছু লজ্জা আর স্ক্যাণ্ডাল প্রকাশ হতে না দেবার জন্যই অনেক দুঃখে এত বড় শিল্পী এই নির্মম শাস্তিও নিঃশব্দে মাথা পেতে নিল। এটা আজ তো সাধারণ মানুষও বুঝছে তোর বাবা আর বাঁচতে চায় না—মৃত্যুই তার একমাত্র কাম্য বলেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার এই আচরণ। কেন—এ-প্রশ্ন অভিজ্ঞ বিচারকদের মনে উঠবে না, তাঁরা ভাববেন না? রায় দেবার বেলায় সেসনের বিচারককে অনেক বাঁধা-ধরা আইনের জালে জড়িয়ে রায় দিতে হয়। কিন্তু রায়ের বিবরণে তিনিও লিখতে বাধ্য হয়েছেন, আসামীর নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনে

একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকার ব্যাপারটা 'মিস্টিরিয়াস'।

আলোর বিষণ্ণ-সুন্দর মুখখানা আশার আলোয় মুহূর্তে অন্যরকম হয়ে গেল।

কিন্তু তিনটে দিন তিনটে রাত বড় অস্থিরতার মধ্যে কেটেছে আমার। যথাসময়ে গেছি। এমন সাক্ষাতের রীতিনীতি ব্যবস্থা কিছুই জানা ছিল না। আমাকে ছোট একটা ঘরে বসতে দেওয়া হলো। তার খানিক বাদে জেল অফিসার দু'জন সশস্ত্র প্রহরীসহ-হাতকড়া পরা অবস্থায় পল্লব দত্তকে সেই ঘরে এনে দাঁড় করালো। নিজের অগোচরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। জেল অফিসারের দু'চোখ কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার মুখের ওপর নিবিষ্ট হলো, তারপর আসামীর মুখের ওপর। তারপর পকেট থেকে চাবি বার করে আসামীর হাত থেকে হাত-কড়া খুলে নিয়ে ঘড়িতে সময় দেখে চলে গেলেন।

দরজার বাইরে সশস্ত্র প্রহরীদের মুখ দেখা যাচ্ছে না, তাদের অবস্থান বোঝা যাচ্ছে।

পল্লবের কন্দর্পকান্তি মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। মাথার জটবাঁধা চুল ঘাড় বেয়ে নেমেছে। তবু চোখ ফেরানো যায় না এত সুন্দর লাগছে। দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানালো। ঠোঁটে হাসি।—বসুন, আমি ডাকলেও এই স্কাউণ্ড্রেলের মুখ দেখতে সত্যি আপনি আসবেন ভাবিনি। এখন দেখছি, অবন্তী মিথ্যে বলত না, আপনি মহানুভব।

কথা না বলে হাত ধরে আগে ওকে একটা চেয়ারে বসালাম, তারপর মুখোমুখি চেয়ারটায় নিজে বসলাম। আর ভিতরটা কেন এত সিরসির করে উঠল জানি না। তরুণ বয়েস পর্যন্ত যে ছেলেকে পাড়ার একটা অবাঞ্ছিত উপদ্রব শুধু ভেবেছি—আর শেষের পনেরো বছর ধরে যার প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ আর ক্রোধের অন্ত ছিল না—এই কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে আর সে-সবের অস্তিত্ব নেই। আমার সামনে যে বসে সে শুধুই শান্ত

সৌম্য প্রশান্ত। এটা অভিনয় মঞ্চ নয়, অভিনয়ও নয়। ঘরের চারদিকে একবার তাকালাম। গা এখনো সিরসির করছে কারণ, কেবলই আমার মনে হচ্ছে, অশরীরী অবন্তী ঘরের কোথাও দাঁড়িয়ে সজল চোখে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

পল্লবের গলার স্বর নিটোল ভারী, কিন্তু কথার সুর হালকা।—যাক, এরা আমাদের বেশি সময় দেবে না, একটা ভারী মজার কথা বলে যাবার জন্যেই আপনাকে আমার বার বার মনে পড়েছে। সে-কথাটা আমি এ-পর্যন্ত কাউকে বলি নি, আপনাকে বলার ইচ্ছে।·· আপনি ইচ্ছে করলে কলম ধরে এই কৌতুকের ব্যাপারটা দেশের মানুষকে জানিয়ে দিতে পারেন। জানলে তারা হয়তো মজা পাবে না, কৌতুকও বোধ করবে না—হয়তো গালে হাত দিয়ে একটু ভাবতে বসবে—যদি বসে সেটা আমার দিক থেকে একটা বড় পাওনা হবে। আমি ঊর্মিকে হত্যা করেছি ··কেন করেছি তা-ও আপনাকে বলব, কারণ, মজার ব্যাপারটা বুঝতে হলে বা বোঝাতে হলে সেটুকুও আপনার জানা প্রয়োজন—কিন্তু আপনাকে ডাকার আসল উদ্দেশ্য কৃতকর্মের কোনো কৈফিয়ত দেবার জন্য নয়—এমন সময় হাস্যকর একটা ব্যাপার এক আমার ছাড়া আর কারো চোখেই পড়ল না বলে, কেউ ভাবতেও চেষ্টা করল না বলে।

শোনা মাত্র আমি উৎসুক হয়ে উঠেছি। কিন্তু সুযোগ পেয়ে সাগ্রহে অন্য প্রসঙ্গটাই আগে তুলেছি। বললাম, তোমার কথা শুনব বলেই আমি এসেছি, কিন্তু তার আগে আমার একটা কথা শোনো—ঊর্মিমালাকে কেন তুমি খুন করেছ সেটা তুমি এ-ভাবে গোপন করে বসে আছ কেন? তোমার মেয়ে আলোর সামনের মাসের মধ্যেই ছেলেপুলে হবে—এ-সময় ওর মানসিক অবস্থার কথা তুমি ভাবতে পারো? ওকালতনামা সই করে তুমি অ্যাপিলে যেতে রাজি হচ্ছ না কেন? মেয়ে-জামাইকে লেখা অবন্তীর শেষ চিঠি আমি নিয়ে এসেছি—সেটা তুমি একবার পড়ে দেখো, সে

লত বড় আশা আর বিশ্বাস নিয়ে এই পৃথিবী থেকে চলে গেছে—
পকেট থেকে খামটা বের করলাম। কিন্তু পল্লব সেটার দিকে তাকালোও না, আমার দিকে চেয়ে আছে। দাড়িগোঁফের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে ঠোঁটে সামান্য হাসির আভাস। বলল, ওটা আপনি রেখে দিন, আমাদের সময় খুব বেশি নেই, অবন্তীর আশা আর বিশ্বাসের খবর আমার থেকে বেশি কেউ রাখে না। আর আমার মেয়েকে বলবেন, যে অ্যাপিলের কথা ওরা ভাবছে সেটা এত হাস্যকর যে এখন ওরা বুঝতেও পারবে না·· সব শোনার পর কৌতুক আর মজার ব্যাপারটা আপনি যদি লেখেন, তারপর বুঝলেও বুঝতে পারে। আরো, আলোকে বিশেষ করে বলবেন মন আর শরীর খারাপ করে ও যেন ওর মায়ের আশীর্বাদের অমর্যাদা না করে।
....এর পর দুজনের কেউই আর আমরা সময় নষ্ট করি নি।
যা বলেছে চুপচাপ কান পেতে শুনে গেছি। যে বলছে আজ আর সে প্রতিভাধর নয়। তবু এই বলাটুকু এত সহজ সরস আর স্পষ্ট যে আমাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যেতে হয়েছে। উর্মিমালাকে যে-কারণে আর যে-ভাবে সে এই পৃথিবী থেকে বিদায় করেছে তার জন্য এখনো তার এতটুকু খেদ বা ক্ষোভ নেই। খুব সংক্ষেপেই সেই বিবৃতি আমার চোখের সামনে তুলে ধরেছে। তারপর থেকে বিচারের দণ্ড মাথায় নেমে আসা পর্যন্ত যা সেটুকুই তার কাছে সব থেকে মজার আর কৌতুকের ব্যাপার। বাস্তব জীবনে সকলের অজানা এক তাজ্জব পরিহাসের ব্যাপার। আমার মারফৎ এই মজা এই কৌতুক আর পরিহাসের ব্যাপারটাই সে মানুষের দরবারে রেখে যেতে চায়।
চল্লিশ মিনিটের সাক্ষাৎকার মনে হলো চার মিনিটে শেষ হয়ে গেল। জানান দিয়ে জেল অফিসার ঘরে ঢুকলেন। শান্ত প্রসন্ন মুখে পল্লব দত্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। দু'হাত কপালে জুড়ে আমাকে নমস্কার জানিয়ে ফিরে চলল। আমি নির্বাক নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে দেখছি।

মাথা উঁচু মানুষটা চলেছে। তার সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে সশস্ত্র প্রহরী। আর হাত-কড়া পরানো হয় নি বলেই হয়তো বাড়তি সতর্ক প্রহরা।

বেরিয়ে সোজা আলো আর বিকাশের বাড়ি এসেছি। কালুও সেখানেই। সকলেই আমার জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল। আলো উত্তেজনায় কাঁপছে।—বাবা অ্যাপিল করতে রাজি হয়েছে?

বললাম, ঠাণ্ডা হয়ে বোস্।···তোর বাবা বলেছে যে অ্যাপিলের কথা তোরা ভাবছিস সেটা এত হাস্যকর যে এখন তোরা বুঝতেই পারবি না।

ওরা তিনজনেই উদ্গ্রীব মুখে চেয়ে আছে দেখে আবার বললাম, তোর বাবা আমাকে কিছু দায়িত্ব দিয়ে গেছে, সেটুকু যদি আমি ঠিক-ঠিক পালন করতে পারি তাহলে তোরাও হয়তো বুঝবি সে খুব মিথ্যে বলে নি। একটু চুপ করে থেকে আবার বললাম, আলো, তোকে শুধু এটুকু বলতে পারি, তোর মায়ের আশা, মায়ের বিশ্বাস একটুও মিথ্যে হয় নি, তোর মায়ের মৃত্যু একটুও ব্যর্থ হয় নি। ··আর একটা কথা, বিশেষ করে তোকে তোর বাবা বলেছে, মন আর শরীর খারাপ করে তুই যেন কক্ষনো তোর মায়ের আশীর্বাদের অমর্যাদা না করিস।

আঁচলে চোখ মুছে আলো বলে উঠল, কিন্তু সব মিলিয়ে কি দাঁড়ালো—বাবা তোমাকে ডেকেছিল কেন?

': বললাম তো, আমাকে কিছু দায়িত্ব নেবার জন্য ডেকেছে, সেটা এখন তোদের বলার মতোও নয়, বোঝানোর মতোও নয়।

প্রায় আর্তস্বরে আলো আবার বলে উঠল, তার মানে বাবা ধরে নিয়েছে তার ফাঁসি হবেই, আর বেশিদিন বাঁচবে না!

': তোকে তো আমি বলেছি, হাইকোর্টের রায়ে আগের দণ্ড যে বহাল থাকবেই এমন ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই, এ নিয়ে তোর বাবার সঙ্গে কোনো কথাই হয় নি। তবে একটা কথা নিজের বিশ্বাস থেকে

তোকে আমি বলতে পারি, তোর বাবা অনেক—অনেক দিন বেঁচে থাকবে।

…হ্যাঁ, এই বাঁচার অর্থটা এরা কেউ খুব স্পষ্ট করে বুঝবে না জেনেও বলেছি।

এর পর আরো দিন-কতক আমি আলো আর বিকাশের বাড়িতে এসেছি। ফাঁক ভরাট করার তাড়নায় অনেক প্রশ্ন করেছি, অনেক কিছু জানতে চেয়েছি। তিন চার দিন সন্ধ্যার পর কালু দত্তর বেহালার বাড়িতেও গেছি। কালুও অকপটে আমাকে সাহায্য করেছে। নির্দ্বিধায় নিজের মনকেও প্রসারিত করে দিয়েছে। নিজের সম্পর্কেও কোনো গোপনতার আশ্রয় নেয় নি বলেই ওর ভেতরটাও আমার চোখে সোনা হয়ে উঠেছে।

…তিরিশ পঁয়ত্রিশ মিনিটের সাক্ষাৎকারে পল্লব দত্ত কিছু ঘটনার উল্লেখ করে যে চিত্রটা আমার সামনে তুলে ধরেছিল, তা কেবল এক বিচিত্র অনুভূতির মোহনায় এসে দাঁড়ানোর চিত্র।

পাঠকের সামনে এই অনুভূতির চিত্রটা সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ের বস্তু করে তুলতে হলে ঢের আগে থেকে—একেবারে শুরু থেকেই শুরু করা দরকার।

শুয়ে শুয়ে মেঘদূত হাতে বিরহ-কাব্যের আকাশে পাড়ি জমাতে চেষ্টা করছিলাম। সেটা খুব সহজসাধ্য হচ্ছিল না, কারণ দেব-ভাষার জ্ঞান শূন্যকুম্ভ, তর্জমার রস ভরসা। বাঁ দিকে মূল সংস্কৃত কাব্য, ডাইনে তার বাংলা অনুবাদ। আমার দু'নৌকোয় পা। তার আগে রেবা-শিপ্রা-বেত্রবতী তটে-তটে ঘুরতে আর অবন্তী-বিদিশা-উজ্জয়িনীর পথে পথে হোঁচট খেতে মন্দ লাগছিল না। এই সব মিষ্টি-গম্ভীর নামের মাধুর্যের সঙ্গে নিভৃত সত্তার যেন কত কালের যোগ।

মেয়ে-কোলে ডাক্তার বৌদি হাজির, লেখক ঠাকুরপো পড়াশুনায় ব্যস্ত নাকি—আমি তো আমার সমস্যা নিয়ে এলাম।

হাসিমুখে উঠে বসলাম, কিছু ব্যস্ত না, আপনার আবার কি সমস্যা!

বলতে বলতে দু'হাত বাড়াতেই তাঁর কোলের ছ'মাসের মেয়েটা আমার কাছে ঝাঁপিয়ে চলে এলো।

মহিলা আমারই সমবয়সী হবেন, বছর পঁচিশ ছাব্বিশ বয়েস। ছয় আর চার বছরের দুটো ছেলের পরে এই মেয়ে। তাঁর স্বামী এই এলাকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য ডাক্তার, সেই দিনে বাড়ি এলে দশ টাকা ফী—কম কিছু নয়। চেম্বারের ফী চার টাকা, তা-ও কিছু নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভদ্রলোকের আহার-নিদ্রার সময় নেই। আমরা তাঁর পৈতৃক বাড়ির একতলার পুরনো ভাড়াটে। বাড়ির কারো শরীর-টরীর খারাপ হলে এত ব্যস্ত ডাক্তারের নাগাল পাওয়া সব সময় সম্ভব হতো না। আমার মা, বোনেরা তখন তাঁর এই স্ত্রীটিরই শরণাপন্ন হতেন। ছোট-খাটো ব্যাপার হলে মহিলা বেশ আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে ফতোয়া দিতেন, এই-এই ওষুধ

দিন, এতবার করে খাওয়ান, ঠিক হয়ে যাবে। বিশ্বাস করুন বা না করুন, অনেক সময়েই ঠিক হয়ে যেত। না হলেও তিনিই দায়িত্ব নিতেন, আধ-ঘণ্টা বা এক-ঘণ্টার চেষ্টায় যে-করে হোক ফোনে স্বামীকে ধরতেন। তাঁর নির্দেশ মতো নতুন ওষুধের নাম লিখে দিতেন, একটু বাড়াবাড়ির ব্যাপার হলে তাঁর সোজা হুকুম, যত ব্যস্তই থাকো দশ মিনিটের জন্য একবার এসে দেখে যাও—আমার ভালো ঠেকছে না।

ভদ্রলোককে আসতেই হতো।

এ-সব কারণেই মহিলাকে আমি ডাক্তার বৌদি বলে ডাকতাম। বলতাম, হাফ না হোক আপনি কোয়ার্টার ডাক্তার তো বটেই।

ফিরে তিনিও আমাকে লেখক ঠাকুরপো বলতেন। লেখক হবার চেষ্টায় আমার তখনো সংগ্রামী জীবন। কিন্তু এই মহিলার কাছ থেকে আমি প্রচুর উৎসাহ পেতাম। ঠাট্টা করে বলতেন, একদিন এমন দিন আসবে যখন আপনি আমাদের চিনবেনও না।

আমি সবিনয়ে বলতাম, এমন দিন যেন তাহলে না আসে।

সেদিন এই মহিলার নালিশ আমারই বিরুদ্ধে। অভিমানের সুরে বললেন, ছ'মাস পার হতে চলল মেয়ের, সামনের মাসে অন্নপ্রাশন—এখনো সকলে বুঁচু আর পিটপিটি বলে ডাকে—রং চাপা হলেও এমন চোখা নাক টানা চোখ মেয়ের, লেখক কাকা হয়ে আপনি তাই শুনে যাচ্ছেন, এত দিনেও ওর একটা নাম ঠিক হলো না!

মেয়েটাকে দু'হাতে সামনে তুলে ধরলাম, সঙ্গে সঙ্গে মেঘদূতের জগৎ থেকে একটা নাম মনের দরজায় ঘা মেরে বসল। বলে উঠলাম, অবন্তী—তোর নাম অবন্তী!

ডাক্তার বৌদি ভাবনায় পড়লেন একটু।—অবন্তী···শুনতে বেশ, কিন্তু একটু ভারী-ভারী লাগছে না?

—একটুও ভারী লাগছে না, চমৎকার নাম—কিরে, নাম পছন্দ হলো

তোর ?

জবাবে মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।

বছর তিনেক বয়েস হতে ওই মেয়েও জেনেছে তার অমন সুন্দর নামটা কাকু দিয়েছে। ওকে নেবার জন্য দিনের মধ্যে বার পঁচিশেক ওর মাকে আমার ঘরে নেমে আসতে হয়, বলেন, বাবা রে বাবা, আমি আর পারি না—য়েমেটাকে আপনিই নিয়ে নিন।

অনেক সময় ওর খাওয়া ঘুমও এই ঘরেই। ও বুঝেছে এই ঘরে বসে আমি লেখা-লেখা খেলা করি। কাগজ-পেন্সিল বা শ্লেট চক নিয়ে মুখ বুজে এই মেয়েও এক-দেড় ঘণ্টা আঁকি-বুঁকি করে কাটিয়ে দিতে পারে। দুরন্ত মেয়ে তখন বেশ শান্ত। ওর মা ওকে বুঝিয়েছেন, কেবল এই খেলার সময়ে কথা বললেই কাকু রেগে যায়—এই খেলার সময় পুজো করার মতো মুখ বুজে থাকতে হয়। আমার হাতের কলম থামতে দেখলে ও হাঁফ ফেলে বাঁচে। তখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কি লিখি, কেন লিখি, স্কুলের মাস্টারমশাইরা আমার লেখা দেখে গুড বলে কিনা। ওর প্রশ্নে-প্রশ্নে জর্জরিত, আর গল্পের বায়না এমন যে আমি বানিয়ে কূল পাই না।

একে একে বছর ঘুরে যাচ্ছে। কাছের ছোট স্কুল পার হয়ে বাসে করে দূরের বড় স্কুলে যায়। পৃথিবীটা ওর কাছে বড় হচ্ছে। কিন্তু তার মধ্যেও আমার এই ঘরটাই এ-বাড়ির মধ্যে যেন ওর একান্ত নিজস্ব জগৎ। ততদিনে ও ভালোই জেনে গেছে আমি কি লিখি। আমার বই ওর মা-কে পড়তে দেখে, তাই নিজেও একসময় বই টেনে নিয়ে গম্ভীর মুখে পড়তে বসে যায়। খানিক বাদেই হাল ছেড়ে বলে, কবে যে বড় হয়ে মায়ের মতো তোমার লেখা বুঝতে পারব জানি না বাপু, এখন তো পাঁচ লাইনও পড়তে ভালো লাগে না।

আমি হেসে বলি, তোর দোষ কি, ভালো লিখলে তো তোর ভালো লাগবে।

দশ বছর বয়স, ক্লাসে ফার্স্ট হয়, বোকা একটুও না যে বিশ্বাস করবে। তক্ষুনি প্রশ্ন, তাহলে মায়ের ভালো লাগে কেন ?

—তোর মা আমাকে ভালোবাসে তাই ভালো লাগে।

আমার অজ্ঞতা ওর কাছে হাসির ব্যাপার।—বাজে কথা বলে আমাকে ভোলাতে চেষ্টা কোরো না বাপু, আমার থেকে বেশি ভালো তোমাকে আবার কেউ বাসে নাকি !

ওর এই বয়েস থেকেই একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। পাড়ার সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে ওর খেলাধুলো লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি। মারামারিও। আর সমবয়সী মেয়েগুলো যেন ওর কৃপার পাত্রী। ওর মায়ের চিন্তা, মেয়েটা যে দিন দিন দস্যি হয়ে যাচ্ছে ঠাকুরপো—আর ওর যত ছুটো-পুটি সব ছেলেদের সঙ্গে !

আরো বছর খানেক বাদে কেবল জায়গার অভাবে ও-বাড়ি ছেড়ে পাড়ার মধ্যেই আমি অন্য বাড়িতে উঠে এলাম। বাড়িঅলা ভাড়াটের মধ্যে এমন আত্মীয়ের মতো সম্পর্ক সচরাচর হয় না। ওঁদেরও ছেলে বড় হচ্ছে, বড় ছেলে কলেজে ঢুকেছে, ঘরের দরকার ওঁদেরও বাড়ছে। তাছাড়া ডাক্তার সাহেবের বাড়িতেই এখন সকালের চেম্বার করার ইচ্ছে। এত খাটুনি আর পোষাচ্ছে না। এ-সব বুঝেও আমি একটু তৎপর হয়েছিলাম। আমরা চলে আসতে সকলেরই একটু মন খারাপ হয়েছে, কিন্তু অবন্তীর কাছে এটা যেন একেবারে অবিশ্বাস্য। প্রথমে ওর রাগের চোটে বাড়ির লোক অস্থির, আর আমার ওপর তেমনি অভিমান। রাগ আর অভিমান কমার পরেও শোকের মুখ। আমার সঙ্গে কথা বলবে না, জীবনে আর কোনো সম্পর্কই রাখবে না।

এই প্রতিজ্ঞা অবশ্য বেশিদিন টেঁকে নি। বাড়িতে না বলেই যখন তখন আমার এখানে চলে আসত। খোঁজ পড়লেই ওর দাদারা বা বাড়ির চাকর আগে আমার এখানে হানা দিত। না বলে আসার জন্য বকা-ঝকা

খেত, আমিও ধমকের সুরে বলতাম, বলে আসিস না কেন?
ও মুখঝামটা দিয়ে বলত, বেশ করি বলে আসি না। একদিন হেসে জবাব দিয়েছিল, চিন্তা করাটা আর শাসন করাটা বাবা-মা আর দেখাদেখি দাদাদেরও একটা নিয়মের মধ্যে, তাই আমি তাদের চিন্তা করা আর শাসন করার সুযোগ দিই। খিলখিল হাসি।
আমি হাঁ, তেরো বছরের মেয়ে বলে কি! বরাবরই এ-মেয়ের গোঁ বেশি তেজ বেশি জানি। কিন্তু ইদানীং ওর কথাবার্তা থেকে হঠাৎ-হঠাৎ মনে হয় নিজের বাবা-মা দাদাদের সম্পর্কে ওর ভিতরে কেমন একটু উষ্মার ভাবও আছে।
সেদিন ওই কথার জবাবে হেসে বলেছিলাম, বাড়ির মেয়ের জন্য চিন্তা হতেই পারে, তা বলে তোকে আবার শাসন কে কবে করে?
': হুঁঃ, করে না আবার, পর-পর দু'দিন চড়িয়ে কালো গাল লাল করে দিল।
আমি হাঁ। তেরো চৌদ্দ বছরের মেয়েটার চোখে আগুন।
': তোকে মারে! কে মারে?
': একদিন বাবা মেরেছে, একদিন দাদা।
': কেন, তুই এমন কি করেছিলি?
যা করেছে শুনে আমিই হতভম্ব।... এখন তো বড় হয়েছে, মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে লেকে বেড়াতে চলে যায়। কাউকে না পেয়ে সেদিন একলাই গেছল। কাছেই লেক। সেখানে পাড়ার কতগুলো ছেলে জুটেছিল। ও তাদের সঙ্গেই বেঞ্চিতে বসে গল্প করছিল। তখন অবশ্য সন্ধ্যা হয় হয়। হঠাৎ সেখানে দাদা গিয়ে উপস্থিত। ওকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এসেই মায়ের কাছে নালিশ। এমন করে বলল যে মা ওর চুলের মুঠি ধরে টেনে একেবারে মাটিতে বসিয়ে দিল। আর অবন্তীর এত রাগ হয়ে গেল যে চিৎকার করে বলে উঠল, একশ' বার যাবে, ছেলে-

দের সঙ্গে মিশবে! আর ঠিক সেই সময়েই ওর বাবা এসে হাজির। মেয়ের গর্জন শুনে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে? দাদাই বলল কি হয়েছে। বাবা আবার ওর চুলের মুঠি ধরে মাটি থেকে টেনে দাঁড় করিয়ে, দু'গালে ঠাস ঠাস করে চারটে চড়। আর হুমকি।—একশ' বার যাবি, ছেলেদের সঙ্গে মিশবি? তারপর মায়ের ওপর হুকুম, ওকে নাচ-গান, তোমাদের ক্লাবে নিয়ে যাওয়া সব বন্ধ করে দাও—কেবল বাসে স্কুলে যাবে আর বাসে ফিরবে!

আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম।—তারপর? তোর দাদা মারল কেন?

: পরদিনই আমি আবার লেকে এসে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত একলাই লেকের বেঞ্চিতে বসে থাকলাম। দাদা এর মধ্যে একদিন তোমার এখানে আমার খোঁজ করতে এসেছিল মনে নেই? না পেয়ে লেকে গিয়ে আমাকে ধরে নিয়ে এলো। একলা বসেছিলাম দেখেও ভাবল কোনো ছেলে আসবে বলেই বসে আছি—বাবা ছিল না তাই সেদিনের শাসনের দায়িত্ব তো দাদারই। যেই মারা ওমনি আমি ফোঁস করে উঠলাম, আর তুমি নিজে কি, ফুটপাথ দিয়ে কোনো সুন্দর মেয়ে যেতে দেখলেই তো রেলিংয়ে ঝুঁকে দেখতে থাকো—সামনের বাড়ির নতুন বউটা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেই তোমারও এসে বারান্দায় হাওয়া খাওয়ার দরকার পড়ে—আমার গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করে না তোমার?

আমি হতভম্ব, তুই দাদাকে এ-কথা বললি?

: বললাম মানে, মায়ের সামনেই তো বললাম। তেরো পেরিয়ে চৌদ্দয় পা দিয়েছি, কচি খুকি নাকি আমি! কিছু বুঝি না? দাদা আরো ক্ষেপে গিয়ে ফের মারতে আসছে, মা-ই তো আটকালে।

অগত্যা গম্ভীর মুখে আমাকেই বলতে হলো, তুই সত্যিই একটু বেশি দুষ্টু হয়েছিস আর বেশি পেকে গেছিস—

': ছাখো কাকু, তুমিও এ-রকম বলবে না—আমার দোষ আমি কারো ভণ্ডামি সহ্য করতে পারি না। এ-দিকে শ'য়ে শ'য়ে ছেলের সামনে মা-দের ক্লাবে আর স্কুলে থিয়েটার করে নেচে গেয়ে কাপ মেডেল আনি সেটা সকলের খুব ভালো লাগে—আর কোনো ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছুটো কথা বললাম তো অমনি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল!

কি বলি ভেবে না পেয়ে আমাকে নিজের গালে হাত বুলোতে হয়েছে। আমার সব সময়েই মনে হতো এই কালো মেয়ের ভিতরটা আলোয় ঝলমল করছে। ওর কত গুণ কত বুদ্ধি সেটা বাইরে থেকে ঠাওর করা শক্ত। স্কুলে বরাবর ফার্স্ট সেকেণ্ডের মধ্যে হয়ে আসছে। গানে যত না হোক, বাচ্চা বয়েস থেকেই নাচের খুব ঝোঁক। ভিতরের প্রবণতা থেকেই হয়তো এই নাচ অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হলে ওর বেশি উৎসাহ, বেশি আনন্দ।

ওদের স্কুলের বাৎসরিক নাচ-গান বা থিয়েটারের উৎসবে আমি না গেলে ওর আনন্দ মাটি। বাবা-মায়ের ছুজনের আমন্ত্রণ থাকে। বাবার জায়গায় প্রতি বছরেই আমাকে যেতে হয়। স্কুলে ওর জীবনের প্রথম অভিনয় কাবুলিওয়ালার ছোট মিনি। ওর খাতিরেই একটা নাচও ঢোকানো হয়েছিল যা দেখে কাবুলিওয়ালা মুগ্ধ। বছর সাতেক বয়েস তখন, বেশ চটপটে মেয়ের পার্ট করেছিল। ন'দশ বছর বয়সে কালমৃগয়ায় ঋষিপুত্র সিন্ধুর নাচ-গানের পার্ট ক'রে সত্যি সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল, আর সেবারই ছু'তিনটে মেডেল পেয়েছিল। তার পরের বছর মেডেল পেয়েছিল ডাকঘর-এর অমলের পার্ট করে। তাতে নাচ নেই। মা-দের ক্লাবে তাসের দেশ করেছে, চণ্ডালিকায় সোনার মেডেল পেয়েছে। স্কুলে ওর শেষ নাচের অভিনয় বাল্মীকি প্রতিভা আর নাচ ছাড়া অভিনয় বিসর্জনের রঘুপতি। রঘুপতি করেও সোনার মেডেল পেয়েছিল, তখন ওর বয়েস সবে ষোল পেরিয়েছে।

এই সময়েই হঠাৎ একদিন এসে বলল, কাকু, কম করে এখন এক বছরের

জন্য তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ, তোমার জন্য আমার স্বভাবচরিত্র খারাপ হয়ে যাচ্ছে—

হেসেই জিজ্ঞেস করলাম, কি রকম ?

‘: বাঃ, অঙ্কে আমি এবার আটতিরিশ পেলাম কি করে, পড়ার বইয়ের মধ্যে রেখে লুকিয়ে তোমার গল্পের বই পড়ি, যে-সব বই দাদার মতে আমার মতো ছোট মেয়ের পড়া উচিত নয়—হাতেনাতে ধরে ফেলে সে-ই বাবাকে দেখিয়েছে—বলেছে মা পড়বে বলে এনে তোমার সব বই আমি এভাবে লুকিয়ে পড়ি—

‘: সত্যি পড়িস নাকি ?

‘: পড়ি তো তবে লুকিয়ে নয়, সকলের চোখের ওপরেই পড়ি—সেদিন স্কুলে নিয়ে যাবো বলে ওই বইটা অঙ্কের বইয়ের নিচে রেখেছিলাম। তাই দেখে বাবা প্রকাণ্ড রকমের দোষ আবিষ্কার করে ফেলেছে।

‘: তারপর ?

‘: তারপর আর কি, বাবার কাছে মা বকুনি খেল, আর এক বছরের জন্য অর্থাৎ হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত আমার ফাংশন করা আর নাটক নভেল পড়া সব বন্ধ।

আমার আঁতে একটু লাগল ঠিকই। তবু বললাম, ভালোই হয়েছে, মায়ের জন্যও এখন আর বই নিয়ে গিয়ে কাজ নেই—মন দিয়ে পড়াশুনা কর, ভালো রেজাল্ট তো করতে হবে।

গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে একটু ভারিক্কি সুরে বলল, আমিও দাদাকে আর মাকে তাই বলে দিয়েছি। ··আমার কথা শুনে দাদা রেগে আগুন হয়েছে, আর মা বেচারি একটু ফ্যাসাদে পড়েছে।

‘: এর মধ্যে রেগে আগুন হওয়া আর ফ্যাসাদে পড়ার কি হলো ?

‘: হলোই তো।···দাদাকে বলেছি তার যে বাংলায় এম. এ. পড়া মস্ত বড়লোক বন্ধু গাড়ি হাঁকিয়ে সপ্তাহে অন্তত দু'দিন করে সন্ধ্যার সময় এসে

রবীন্দ্র কাব্যগীতি নাট্যগীতি নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে বসে
আর তোমাকে বোঝায় আমি কত ব্রিলিয়েন্ট মেয়ে এখন তাকে আসতে
বারণ করে দিও—এলে তার নাকের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমি
চিৎকার করে লেট এ বি সি বি এ ট্র্যায়েঙ্গেল শুরু করে দেবো।
আমি হেসে উঠেছি।—তারপর তোর দাদা?
': বয়েস অনুযায়ী একটু ধিঙ্গি হয়ে উঠেছি তো, মারার জন্য দাদার
হাত উঠতে মায়ের ধমক খেয়ে আবার নামাতে হলো।···আর মা ফ্যাসাদে
পড়েছে এক বছরের মধ্যে কেউ আমাকে কোনো ফাংশনে দেখবে না
প্রতিজ্ঞা করার ফলে। দেড় মাসের মধ্যে তাদের ক্লাবের চ্যারিটি ফাংশন,
গভর্নরকে আনার চেষ্টা হচ্ছে, আমি বসে গেলে তো আবার একজন
রক্তকরবীর নন্দিনীকে খুঁজে বার করতে হবে—মায়ের মাথায় হাত
পড়বে না?
': খুব মজা লাগছে। জিগ্যেস করলাম, কি ফয়েসালা হলো?
': কি আবার হবে, টোটাল সারেনডার। মা কথা দিল, পড়াশুনায় মন
দিলে বাবা কোনো ফাংশনের ব্যাপারে আপত্তি করবে না।
এ-বয়সেই এই মেয়ের জোরের দিকটা লক্ষ্য করছি।
খোশমেজাজে উঠে দেয়াল-আলমারি খুলে বই ঘাঁটতে চলল। এ
ব্যাপারে ওর অবাধ স্বাধীনতা। নিজে পড়ার জন্য কখন কি বই আনি
তাতেও কৌতূহল। কিন্তু তার আগেই কি মনে পড়তে ফিরে এলো।
'. আচ্ছা কাকু, বড় হয়েও মায়ের কাছে শুনেছি, অন্নপ্রাশনের আগে
নামের জন্য মা আমাকে নিয়ে তোমার কাছে আসতেই তুমি নাকি
তক্ষুণি অবন্তী নাম বলেছিলে—কেন বলো তো···ডিকশনারি খুলে
দেখলাম ও তো এক জায়গার নাম ছিল, মালব দেশ না কোথাকার
রাজধানী—হঠাৎ এ-নাম তোমার মনে এসেছিল কেন?
বললাম, তোর অপছন্দ হলে হায়ার সেকেণ্ডারি দেবার আগে এফিডেফিট

করে বদলে ফ্যাল্—

ও হাসিমুখে জানান দিল, নিজের নাম নিয়ে আমি কখনো ভাবিই নি ···হঠাৎ এক গুণীজনের মুখে শুনলাম নামটা নাকি খুব আর্টিস্টিক, আর এ-নামেই আমাকে মানায়—চলন্তিকা খুলে আর্টফার্টের কিছুই দেখলাম না, তাই ভেবেছিলাম জিগ্যেস করব তুমি কি ভেবে এই নাম দিয়েছিলে।

হেসেই জবাব দিলাম, সেদিন আমি কালিদাসের মেঘদূত নিয়ে পড়-ছিলাম, আর তার পটভূমি অবন্তী বিদিশা উজ্জয়িনীতে ঘুরছিলাম, কাব্য বর্ণনায় জায়গার নামগুলো এক একটা মেয়ের মতো জীবন্ত লাগছিল— তোর বেলায় ফস করে অবন্তী নামটাই মুখে এসে গেল।

উৎসুক মুখে শুনে নিয়ে জিগ্যেস করল, কালিদাসের মেঘদূত ব্যাপার-খানা কি বলো তো?

': এখন আর তোকে মেঘদূত নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, পরীক্ষার পড়ায় মন দে। তারপর ও কি বলেছিল খেয়াল হতে জিগ্যেস করলাম, তোকে আর্টিস্টিক নামের সার্টিফিকেট দিল এমন গুণীজনটা কে?

প্রথমে হাসি, পরে গম্ভীর।—আমার একজন হালের অ্যাডমায়ারার— বড় জাতের শিল্পী।

বোকা মুখ করে তারপরেও জিগ্যেস করলাম, বড় জাতের শিল্পী মানে তোর থেকেও ভালো নাচে?

হেসে অস্থির।—তুমি যে কি করে এত লেখো বুঝি না কাকু, ব্যাটাছেলে নাচবে কি! তাছাড়া এক মেয়ে অন্য মেয়ের অ্যাডমায়ারার হয়?

এবার আমি গম্ভীর, তোর বাবা রাগারাগি আর বকাঝকা করে, এরপর তুই আমার হাতে থাপ্পড় খাবি—রক্তকরবীর পর হায়ায় সেকেণ্ডারি পরীক্ষা পর্যন্ত আর কোনো কিছুতে মন দেওয়া চলবে না আমিও বলে দিলাম!

হাসতে হাসতে আবার বইয়ের আলমারির দিকে গেল। আমারই একটা

পুরনো বই বার করে নিয়ে ফিরে চলল। বলল, ছেলেবেলায় পড়েছিলাম, ভালো বুঝিনি—আর একবার পড়ে দেখি…

বেশ শাসনের সুরেই আঙুল তুলে আলমারি দেখিয়ে বললাম, রাখ্ ওটা!

এক মুহূর্ত থমকালো তারপর জোরেই হেসে উঠল।—ছাখো কাকু, তুমি হাজার চেষ্টা করলেও বাবার মতো হতে পারবে না।

হাসতে হাসতেই বই নিয়ে বেরিয়ে গেল।

·· দেড় মাস বাদে ওদের 'রক্তকরবী' চ্যারিটি শো দেখতে গিয়েই কি অবন্তীকে নিয়ে আমার মনে কোনো অনাগত আশংকার ছায়া পড়েছিল? পরে মনে হয়েছে পড়েছিল কিন্তু কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনি বলে সেটা বাতিল করেছিলাম।

চ্যারিটি শো। অবন্তী আমাকে প্রথম সারির একখানা পঁচিশ টাকার টিকিট গছিয়ে গেছল। যতদূর মনে পড়ে বাষট্টি সাল সেটা। তখন পঁচিশ টাকার দাম কম কিছু নয়। সেই প্রথম সারিতেই একটা চেনা ছেলের মুখ দেখে আমি প্রথমে একটু অবাক হয়েছিলাম। গত ছ'সাত বছর ধরে ছেলেটাকে আমাদের পাড়ায় দেখছি। এখন বছর বাইশ তেইশ বয়েস। চোখে পড়ার মতোই চেহারা। লম্বা, টকটকে ফর্সা গায়ের রং, তেমনি নাক মুখ চোখ। কিন্তু এ ছাড়াও একটি বিশেষ গুণে ওই ছেলে আমাদের এলাকার একজন পাণ্ডা গোছের হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ কলকাতায় আমাদের অনেকটা এলাকা জুড়ে বছরে ছুটো করে নাটক অভিনয় হয়। একটা দুর্গা পুজোর পরে আর একটা সরস্বতী পুজোর রাতে। গত তিন বছর ধরে এই অভিনয়ের বাঁধাধরা নায়ক ওই ছেলে। গেল বারের সরস্বতী পুজোর নাট্যানুষ্ঠানে পাড়ার লেখক হিসেবে আমি সভাপতি ছিলাম। কর্ণার্জুনে কর্ণের ভূমিকায় ওকে দেখে আমিও অভিভূত হয়েছিলাম

সন্দেহ নেই। অর্জুন বা কৃষ্ণ ওর সামনে মিয়নো চরিত্র মনে হয়েছিল। অতিথি সৎকারের সময় নিজের ছেলেকে কাটা বা ব্রাহ্মণ-বেশী ইন্দ্রকে কবচ-কুণ্ডল দান করার সময় দর্শকচিত্ত হায়-হায় করে উঠেছিল। কারণ সব ষড়যন্ত্র জেনেও কর্ণ দাতাকর্ণ হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী সংবাদেরও অনেকটাই এই অভিনয়ে যুক্ত করা হয়েছিল। আমি সব থেকে অভিভূত হয়েছিলাম মায়ের প্রতি অভিমানে ছেলের সেই বিষাদ গম্ভীর উদার অভিনয়ের দৃশ্য দেখে। অভিনয়ের জন্য এই ছেলের এখন অন্য পাড়া থেকেও ডাক আসে। কোনোরকমে বি. এ. পাশ করে এক অফিসে কেরানির চাকরি করছে। থিয়েটার-প্রেমী অফিস-ক্লাবের কোনো মাতব্বরের সুপারিশের জোরেই তার চাকরি, এমন খবরও কানে এসেছিল।

·· এই রূপ বা গুণ সত্ত্বেও আমি অন্তত কখনো এই ছেলেকে সুনজরে দেখিনি। দায়-দায়িত্ব আছে এমন ভদ্র পরিবারের কেউই দেখে কিনা সন্দেহ। তার মদ গেলার সুনাম পাড়ার লোকের অন্তত না জানার কথা নয়। রাত বারোটা একটার সময়ও মদে চুর হয়ে রিকশয় গা এলিয়ে তাকে বাড়ি ফিরতে দেখা যায়। তার পুরুষ ভক্ত অনেক। দুই একটি মেয়ে ভক্ত নিয়েও তাকে আমি নিউমার্কেট গঙ্গার ধার বা লেকের দিকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি।

···যাক, এই ছেলেই অবন্তীর হালের অ্যাডমায়ারার সেই বড় জাতের শিল্পী কিনা এ-চিন্তা মনে ঠাঁই দিইনি। বয়েস মাত্র ষোল পেরুলেও অবন্তী বোকা মেয়ে একটুও নয় এ আমি অন্তত জানি।···ছেলেটা অভিনয় ভালবাসে তো বটেই, কেরানি হয়েও পঁচিশ টাকার টিকিট কাটবে এতে খুব অবাক হবার কি আছে।

···রক্তকরবীতে নন্দিনীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সকলেই করেছে। একজন পয়সাঅলা দর্শক সোনার মেডেল দেবার ঘোষণাও করেছেন। দু'দিন

বাদে ঘরে পা দিয়েই অবন্তী জিগ্যেস করেছে, কেমন দেখলে কাকু ?

‘: আমি বললাম, প্রশংসা শুনতে খুব ভালো লাগে বুঝি ?

‘: তা তো লাগেই।

‘: তা হলে করছি প্রশংসা।...তোর হালের অ্যাডমায়ারার সেই বড় জাতের শিল্পী দেখতে গেছল ?

‘: গেছল। একটুও দ্বিধা সংকোচ নেই।

‘: সে কি বলল ?

‘: দেখা হয় নি। ডাকে এক শব্দের চিঠি দিয়েছে, কংগ্র্যাচুলেশনস। আমিও এক শব্দেরই জবাব লিখেছিলাম, থ্যাংকস্। তারপর তা-ও ছিঁড়ে ফেলেছি। জবাব না দেওয়াই বেস্ট জবাব না ?

খুশি হয়েই জবাব দিয়েছি, নিশ্চয় বেস্ট।

কৌতূহল সত্ত্বেও আর কিছু জিগ্যেস করিনি। আমার ভুলই হয়ে থাকবে, এই মেয়ের মর্যাদাবোধ টনটনে।

অবন্তী হাই ফার্স্ট ডিভিসনেই হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেছে। অঙ্কে মাত্র একচল্লিশ না পেলে আরো অনেক ভালো রেজাল্ট হতো। এসে পায়ে হাত দিয়ে বলেছে, আমার সতীন-কাঁটা দূর হয়েছে, এবারে বাংলার সঙ্গে কেমন ঘর করি দেখে নিও।

ওর সতীন-কাঁটা অঙ্ক।

অবন্তী এর পর মধ্য দক্ষিণ কলকাতার সব-থেকে নামী মেয়ে কলেজের বি এ ক্লাসের ছাত্রী। বাংলায় অনার্স পড়ছে। ততদিনে ওর ডাক্তার বাবার গাড়ি হয়েছে। বাড়ি থেকে কলেজ পর্যন্ত বাস আছে, ট্রাম নেই। কিন্তু যাবার সময় সেই বাসে ঠাসাঠাসি ভিড়। এই ভিড় ঠেলে মেয়ে কলেজে যাবে এটা ওর মায়ের পছন্দ নয়। এই নিয়েও মায়ের সঙ্গে মেয়ের বচসা। মেয়ে বলে, শয়ে শয়ে মেয়ে ট্রাম-বাসে গুঁতোগুঁতি করে কলেজ যাচ্ছে আসছে। তাদের কি গায়ে ফোসকা পড়ছে ? বাবা কখন

কোন্ দিন কোথায় কলে যাবে তার ঠিক আছে ?—আমার গাড়ির দরকার নেই।

কিন্তু বাবা যদি সকাল সাড়ে ন'টা থেকে দশটা সোয়া দশটা পর্যন্ত গাড়ি ওকে ছেড়েই দেয় তাহলে আর বলার কি আছে। বাবার এমারজেন্সি কল্ কিছু না থাকলে যাবার সময় সেই ব্যবস্থাই হয়েছে। ফেরার সময় সে-রকম অসুবিধে কিছু নেই। বি. এ-র প্রথম বছরে অবন্তীর তিনটের থেকে চারটের বেশি ক্লাস নেই। বাসে তখন অত ভিড় থাকে না। কিন্তু শনিবার দিন ফেরার সময়েও যে বাসে যন্ত্রণাদায়ক ঠাসাঠাসি ভিড় হয় অবন্তীর মা সেটা পরে জেনেছে। সেই সময়ে কোনো সরকারি কলেজে সপ্তাহে পাঁচ দিন ক্লাস ছিল না। পরে ওর মা জানতে পেরে আমাকেই দুঃখ করে বলছিলেন, মেয়েটার কি-যে মতি হলো বুঝি না—ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতেই ওর ভালো লাগে, নইলে সপ্তাহে একটা দিন ফেরার জন্য গাড়ি পাঠাতে এমন কি অসুবিধে।

মায়ের এই নালিশের কথা বলতে অবন্তী হেসে সারা। বলেছিল, সত্যি কাকু, সুবিধে পেলে বাসের লোকগুলো ভিড়ের মধ্যে কি অসভ্যতা যে করে না—কলেজের ছেলে-ছোকরাগুলো কিন্তু সে তুলনায় ঢের ভদ্র। আমার প্রশ্ন, তাহলে শনিবারে আসার সময় তুই বাড়ির গাড়ি পাঠাতে বলিস না কেন ?

': কি হবে বলে, শনিবার ছাড়াও প্রায় দিনই বাসে খুব একটা কম ভিড় থাকে না, কম দিনই বসে আসতে পারি—তাছাড়া শনিবারে তো বেশির ভাগ রাস্তা আমরা হেঁটেই মেরে দিই। ট্রাম রাস্তায় এসে কোথাও থেকে ট্রাম ধরতে চেষ্টা করি।

মেয়ে কলেজে পড়ে, এই 'আমরা' বলতে আমার মনে কোনোরকম রেখাপাত করার কথা নয়, করেওনি।

কিন্তু এই বি. এ. পড়ার একটা বছর না যেতে ওকে নিয়ে আমার চিন্তার

কারণ ঘটল। কলেজের প্রথম বছরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও-ই সর্বেসর্বা। চিত্রাঙ্গদা হচ্ছে—মেক-আপ বদলে 'সুরূপা-কুরূপা' দুই ভূমিকাই অবন্তীর। ও নিজে এসে আমাকে গেস্ট-কার্ড দিয়ে গেছে। সানন্দেই গেছি। কিন্তু তারপর ধাক্কা আমার তিনটে সীট পরে গেস্ট আসনে যে লোকটি বসে তাকে দেখে। পাড়ার সেই কন্দর্পকান্তি নাম-করা অভিনেতাটি। চেহারা ছেড়ে বেশভূষা দেখেও কেউ ভাবতে পারবে না ওই লোক অফিসের কেরানি। যাক, পৃথিবীর কোনো কেরানির প্রতি আমার এতটুকু অশ্রদ্ধা নেই, অতি বড় চাকুরে বা ধনীর দুলাল হলেও আমার এ-রকমই মেজাজ খারাপ হতো। মেজাজ খারাপ হবার কারণ আমার সেই প্রায় ভুলে-যাওয়া সন্দেহ এই ছেলেকে এখানে দেখা মাত্র নতুন করে দানা বাঁধল। এখানে ওই ছেলে এই কলেজের অন্য যে-কোনো মেয়ের আত্মীয় হতে পারে, তার অভিনয়-ভক্ত অন্য যে-কোনো মেয়ের আমন্ত্রণে এসে থাকতে পারে। তবু আমার ভিতরে অস্বস্তি থেকেই গেল।

মঞ্চের অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে অনেক বার লক্ষ্য করেছি। ওই ছেলে তন্ময়, নিবিষ্টচিত্ত।

অবন্তীকে জিগ্যেস করব-করব করেও সুযোগের অভাবে পেরে উঠিনি। ভেবেছিলাম অভিনয় নিয়ে কখনো কোনো প্রসঙ্গ উঠলে জানতে, বুঝতে চেষ্টা করব। কিন্তু সে-রকম সুযোগ হয়ে ওঠে নি। অবন্তীর আমার এখানে আসাও অনেক কমেছে। এক-আধ দিন বিকেলে ওদের বাড়ি গিয়েও দেখা পাইনি। ওর মা বলেছেন, কোথায় যায় বলে তো যায় না।...তবে পড়াশুনোর দিকে একটু মন গেছে, রাত জেগে পড়াশুনা করে।

কখনো সখনো দু'দশ মিনিটের জন্য আসে, নতুন কি লিখছি খবর নেয়, আমি বাড়ি না থাকলে ওর কাকিমার (আমার স্ত্রী) সঙ্গে একটু গল্প-টল্প করে চলে যায়। আবার আমার লেখার সমালোচনাও নাকি করে।

সেদিন হাসতে হাসতে স্ত্রীকে বলে গেছল, গল্প উপন্যাসে হৃদয়শূন্য লোকের মধ্যেও হৃদয় খোঁজা কাকুর একটা বাতিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে—কাকুর আর একটু প্র্যাকটিকাল হওয়া উচিত, এটা হৃদয়ের যুগ নয়।

ওদের কলেজের পরের বছরের ফাংশনে আবার আমাকে গেস্ট-কার্ড দিতে এলো। ভারী খুশি, এবারে আর নাচ-ফাচের ব্যাপার নেই, দারুণ রোল ওর—'শেষের কবিতা'র লাবণ্য।

জিগ্যেস করলাম, অমিত রে কে ?

নাক মুখ কুঁচকে জবাব দিল, আর বোলো না, ফাইনাল ইয়ারের একটা চাল-বাজ মেয়ে—ভাবতেও এত খারাপ লাগে।

': কোনো ছেলে হলে ভালো হতো ?

': ভালো হতো না। অমিত রে বা সুশোভন যার সঙ্গেই অভিনয় করি, স্টেজে যদি মনে পড়ে যায় সে একটা মেয়ে তাহলে চিত্তির না—ওটুকু ভুলতে আমাকে কম ধকল পোহাতে হবে ?

': কিন্তু তোর নিজের রোল পছন্দ হয়েছে ?

': দারুণ।

': কি করে হলো, লাবণ্য তো হৃদয় খোঁজে বলেই অমিত রে-কে ছেড়ে সুশোভনের দিকে সরে গেল ?

থমকালো একটু। তারপর খিলখিল হাসি।—কাকিমা বলেছে বুঝি তোমাকে ? তুমি না মানলেও আমি ঠিক কথাই বলেছি, রবি ঠাকুর যে কালের ওপর দাঁড়িয়ে শেষের কবিতা লিখেছে তুমি কি সেই কাল নিয়ে বসে থাকবে—দিন বদলায় নি যুগ বদলায় নি ?

খুশি মুখেই সায় দিয়ে বললাম, অনেক—অনেক বদলেছে—কিন্তু সত্যও কি বদলেছে ? সকালের লাল সূর্যটা লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো, কালের মুখ আর যুগের মুখ চেয়ে তারও তাহলে রূপ-রং বদলানো উচিত ছিল বল্—

অবন্তী ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো খানিক। এটুকু বেশি মিষ্টি লাগল আমার। ও স্বীকারোক্তির মতো করে বলল, সত্যি বলছি কাকু, এ সমালোচনাটা ঠিক আমার নয়, আর একজনের মুখে শুনেছি···তখন মনে হয়েছিল অনেকটা ঠিকই বলছে, কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, হৃদয় নেই দেখাতে হলেও তো সেই আক্ষেপটাই বড় করে তুলতে হবে·· নইলে তো শিল্পের গলা টিপে মেরে ফেলা হবে।

আমি ভিতরে ভিতরে সজাগ একটু।—আমার সম্পর্কে ওই সমালোচনা কে করেছে, তোদের কলেজের কোনো প্রফেসার?

—না, একজন আর্টিস্ট···মানে উঁচুদরের অভিনেতা। এবারে দেখা হলে বলতে হবে, 'হৃদয় নেই'-এর অভিনয় করতে গিয়ে সে-ও তো পজিটিভ বা নেগেটিভ রাস্তা ধরে হৃদয়ের কান্না শুনিয়েই দর্শক মাত করে!

আমি গম্ভীর।—সেই উঁচু দরেরর আর্টিস্টও তোদের শেষের কবিতা দেখতে যাচ্ছে তো?

মুখের দিকে চেয়ে থমকালো একটু।—যাচ্ছে তো···কেন?

—তাহলে আমি যাচ্ছি না।

আবার হতভম্ভ কয়েক মুহূর্ত।—কেন! তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

একটু কঠিন স্বরেই জবাব দিলাম, আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, তোর সঙ্গে সম্পর্ক গজাচ্ছে বলেই আমি যাব না—পল্লব দত্ত কি ছেলে কেমন ছেলে তোর জানা নেই? চেহারা-সর্বস্ব আর অভিনয় ভালো করে—শুধু এই গুণে সে তোর মতো মেয়ের নাগাল পাবে?

অবন্তীর সুশ্রী কালো মুখ বিবর্ণ কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু অপলক। কথাগুলো খুব ধীর খুব ঠাণ্ডা।—পল্লব দত্ত আমার নাগাল পাচ্ছে তুমি জানলে কি করে?

': এখন নয়, তিন বছর ধরে তোর সব ফাংশনে ওকে দেখে আসছি।

আবার চুপ একটু।—পল্লব দত্ত কি ছেলে কেমন ছেলে তুমি জেনে

ফেলেছো ?

': শুধু আমি কেন, এ-পাড়ার সকলেই জানে! আমি তাকে বেশি রাতে মদ খেয়ে রিকশয় চেপে বাড়ি ফিরতে দেখি—অনেক মেয়ের সঙ্গেও তাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি।

চেয়ে আছে।—শীগ্‌গির···ধরো! এক বছরের মধ্যে মদ খেয়ে রিকশয় চেপে ফিরতে বা অন্য মেয়ের সঙ্গে তাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছ ?

মনে করতে পারলাম না। তবু জোর দিয়েই বললাম, তুই বলতে চাস এক বছরের মধ্যে তার চরিত্র বদলে গেছে ?

একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল, বদলে গেছে বলতে চাই না, বদলাতে চেষ্টা করছে এটুকু বলতে পারি।···কিন্তু তোমার মতো হৃদয়বান লেখক বাইরে থেকে কারো এ-টুকু দেখেই তার বিচার শেষ করে দেবে এ আমি ভাবিনি। যাক, তোমার যদি মনে হয় আমি নোওরা কারো সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছি তাহলে এসো না, তবে এটুকু জেনে রাখো আমি তার মনের নাগাল ঠিক-ঠিক না পাওয়া পর্যন্ত সে কেন, কেউ আমার মনের নাগাল পাবে না।

চলে গেল। আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।···এই বয়সের দুটো ছেলে-মেয়ে মনের দিক থেকে কাছাকাছি এলে বা আসতে চাইলে যুক্তির খড়গ তুলেও তাদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয় না এমন নজির আমি অনেক দেখেছি। তবে একটাই আশা, অবন্তীকে এখনো আমি কাঁচা মেয়ে ভাবি না, ওই ছেলের মনের নাগাল পেতে গিয়ে ও হয়তো নিজে থেকেই সরে আসবে।

ওদের ফাংশন মানে শেষের কবিতা দেখতে গেছলাম। প্রথম সারির দর্শকের আসনে পল্লব দত্তকেও দেখেছি। আমার বাড়ি থেকে ওর বাড়ি কম করে দশ বারো মিনিটের হাঁটা পথ হলেও একই পাড়ায় থেকে আমাকে তার ভালোরকম না চেনার কোনো কারণ নেই। কিন্তু অবন্তীর

ফাংশনে এতবারের মধ্যে এবারই প্রথম সে আমাকে লক্ষ্য করল। ওর সীটের পাশ দিয়ে যাবার আগেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো, দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানালো। হাসি-হাসি মুখ, ভদ্র, বিনীত। অমনিতে দেখলে চোখ আর মন জুড়নো ছেলেই বলতে হবে।

সামনের সারিতে আমারও আসন, তবে মাঝের ফারাকের অন্য দিকে। আমি নিঃসংশয় আমাকে নিয়ে অবন্তীর সঙ্গে ওর কথা হয়েছে। তা না হলে এবারেও ও-ছেলের আমাকে লক্ষ্য করার কথা নয়, আর করলেও এতটা সৌজন্য দেখানোর কথা নয়।

শো শুরু হলো। মন দিয়েই দেখতে লাগলাম। মন্দ লাগছে না। লাবণ্যর রোলে অবন্তীকে খুবই ভালো লাগছে। বইয়ে যেমনটি, সংযত কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত।

হাফ-টাইমে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম কি-রকম হল, কত লোক হলো আর তারা কি ধরনের দর্শক।

': না এসে পারলে ?

সামনে তাকিয়ে দেখি লাবণ্যবেশিনী অবন্তী। হাসিমুখ। আমিও হেসে মাথা নাড়লাম, অর্থাৎ, পারলাম না।

': পল্লব বলছিল তুমি আসবে না, আমার চ্যালেঞ্জ ছিল আসবেই।··· স্টেজের ফ্লাড লাইটের ও-ধার থেকে ভালো বোঝা যায় না, তবু ঠিক লক্ষ্য করেছি—

কারো দিক থেকেই আর কিছু বলার ফুরসত মিলল না। একজন মহিলা আর তাঁর পিছনে আরো গুটিকতক মেয়ে এসে হাজির। হাসি-মুখে নমস্কার করে মহিলা বললেন, অবন্তী আর এই মেয়েরা আমার ছাত্র—আপনি এসেছেন বলে খুব খুশি হয়েছে—শোয়ের পর চলে যাবেন না, একটু চা খেয়ে যেতে হবে।

আমি তক্ষুণি সবিনয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলাম, সেটা সম্ভব হবে না। মেয়ে-

দের একজন বলল, দল বেঁধে একদিন আমরা আপনার বাড়িতে গেলে বিরক্ত হবেন না তো ?

হেসেই জবাব দিলাম, সেটা তো যাবার পরে বিচার্য, আগে এসে ভ্যাখো—

আর একটি মেয়ে প্রস্তাব করল, আপনাকে এখানেই একটু চা পাঠিয়ে দিই তাহলে ?

সবিনয়ে তা-ও নাকচ করলাম।

অবন্তীর দ্বিতীয়ার্ধের অভিনয় আরো ভালো লাগলো। কে বলবে এই শান্ত সংযত মেয়েই চিত্রাঙ্গদায় কুরূপা-সুরূপার ভূমিকায় স্টেজ মাত করেছিল। এক ভূমিকায় তার বিজয়িনী হবার কঠিন সংকল্প, দ্বিতীয় ভূমিকায় তার বিজয়িনী মূর্তি। আর এখানে শান্ত চিত্তে প্রেয়সীর ভূমিকা বাতিল করে শাশ্বত বধূর ভূমিকা বরণ। মেয়েটার পার্টস আছে।

শো শেষ হতে বেরিয়ে এলাম। তারপরেই পল্লব দত্তর মুখোমুখি। কেমন মনে হলো আমার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে। কাছে এসে হাসিমুখে জিগ্যেস করল, কেমন দেখলেন ?

সাদাসিধেভাবে ফিরে বললাম, এখানে ভালো-মন্দ বিচারের তুমিই সেরা অধিকারী, তোমার কি-রকম লাগলো ?

চেহারা মিষ্টি চাউনি মিষ্টি হাসি মিষ্টি গলাখানাও নিটোল ভারী আর মিষ্টি। হেসে জবাব দিল, ভালোই···তবে অবন্তীর এমন সুন্দর অভিনয় মাঠে মারা গেল।

একটু তেরছা সুরে জিগ্যেস করলাম, কেন···স্টেজের অমিত রে-ও একটা মেয়েই সেটা ভুলতে পারছিলে না ?

সামান্য শব্দ করে হাসল।—তা কেন, মেয়ে কলেজের অভিনয়ে ছেলে কোথেকে আসবে, সেটুকু মেনে নিয়েই দেখ ছিলাম—কিন্তু এই মেয়েটির রবীন্দ্রনাথের অমিট রে'র কন্‌সেপশনেই একটু গলদ থেকে গেছে···

অমিট রে নিজের প্রাণসম্পদে মুখর আর কিছুটা বেপরোয়া কিন্তু ফাজিল বা বাচাল নয়।...ট্যালেণ্টের উচ্ছ্বাসে এই মেয়েটি ওভারঅ্যাকটিং করে ফেলছিল মনে হয় নি আপনার? তার তির্যক অভিনয়ে গভীরতার দিকটা বা প্রতিভার দিকটা কি তেমন ফুটেছে?

একটু দ্বিধার মধ্যেই পড়ে গেলাম। ধরিয়ে দেবার পর সেই রকমই মনে হচ্ছে বটে। অতটা ভাবি নি, অমিত রায়ের অভিনয় একটু কেবল কৃত্রিম লাগছিল। তবু বললাম, এই বয়সের মেয়েরা যা করেছে বেশ করেছে—

এবারে একটু বেশি শব্দ করেই হাসল।—স্নেহের চোখ দিয়ে দেখতে হলে ঠিকই বলেছেন, কিন্তু শেষের কবিতার ছেলে-মেয়েরা মোটামুটি এই বয়সেরই...অবন্তীর অভিনয় দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন একেবারেই বইয়ের লাবণ্য হয়ে উঠে এসেছে।

খুব অতিরঞ্জিত না হলেও এই ছেলের স্তুতি আমার খুব পছন্দ হলো না।

৪

অবন্তীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আমার আরো কমে এসেছে। মাঝে মাঝে আমি বাইরেও চলে গেছি। কিন্তু মেয়েটার জন্য ভিতরে ভিতরে একটু উদ্বেগ থেকেই গেছে। ফিরে এসে বাড়িতে ফোন করে কখনো ওকে পেয়েছি, কখনো পাই নি। পেলে উল্টে ওরই অনুযোগ, মাসের মধ্যে সতেরো দিন তো বাইরে কাটাও, আমি খবর রাখি না ভাবো—তবে সত্যি আমিও ভীষণ ব্যস্ত, কত দিন যাই-যাই করেও গিয়ে উঠতে পারি নি, তোমার কাছে গেলে ছু'ঘণ্টার আগে তো আর উঠতে ইচ্ছে করে না—এদিকে ফাইনাল ইয়ার শুরু হলো, অথচ বই-পত্রে ধুলো জমছে।

আমার গম্ভীর প্রশ্ন, বই-পত্রে ধুলো জমছে তাহলে তুই এত ব্যস্ত কি নিয়ে?

ওদিক থেকে হাসি, জেরা কোরো না বাপু, ভালো লাগে না, তুমি সে-রকম রবীন্দ্রভক্ত হলে বুঝতে অ-কাজের কাজও কম কাজ নয়।

আমার মন্তব্য, এই কথা বলে বলেও রবীন্দ্রনাথ শেষ সময় পর্যন্ত কেবল কাজই করে গেছেন—তুই কি সে-রকম কিছু অ-কাজের কাজ করছিস?

আবার হাসি।—আমার অ-কাজের কাজও সহজ নয় খুব, নোনা-সমুদ্রে ডুবে ডুবে মুক্তো খুঁজে বেড়াচ্ছি।

থমকে রইলাম একটু। তারপর খুব গম্ভীর গলায় জিগ্যেস করলাম, ঘরে আর কেউ আছে?

—না, কেন?

—সেই গুণী আর্টিস্টের খবর কি?

—দারুণ! ফোনের গলায় উচ্ছ্বাস, এ ছু'বছরে অভিনয়ে আরো কত

যে ইমপ্রুভ করেছে যদি দেখতে—এখন তো মাসের মধ্যে ওকে দু'তিনটে করে অভিনয় করতে হয়, নানা অফিস-ক্লাবের ফাংশনে ওকে গেস্ট আর্টিস্ট হিসেবে ধরে নিয়ে গিয়ে মেন্ রোলে নামিয়ে দেয়। আর বেশ ভালো টাকাই পকেটে গুঁজে দেয়। দিন কতক আগে এক পেশাদার গ্রুপের নায়ক অসুস্থ হয়ে পড়তে ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে ভালো টাকা দিয়ে এক সপ্তাহে চারটে অভিনয় করিয়েছে, কাগজে প্রশংসাও বেরিয়েছিল—ছাখো নি?

—না। তুই তাহলে এখন কেবল ওর থিয়েটারই দেখে বেড়াচ্ছিস?

হাসি।—তোমার গলায় রাগ চাপা থাকছে না কাকু, ছাড়ি—তবে তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো কাকু, বইয়ে ধুলো জমুক আর যা-ই হোক, পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হবে না।

…দিন মাস গড়িয়ে যাচ্ছে। অবন্তীর বি. এ. ফাইনাল পরীক্ষার আর চার মাসও বাকি নেই। আমার কি-যে কর্তব্য ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।…শনিবারের এক দুপুরে অবন্তী আর পল্লবকে পার্ক সার্কাসের ময়দানের দিক থেকে গল্প করতে করতে আসতে দেখেছি। আমি গাড়িতে আসছিলাম। একবার ভাবলাম তুলে নিই। কিন্তু অন্যজনকেও গাড়িতে তুলে আস্কারা দেবার ইচ্ছে নেই। চলে এলাম। ওদের মুখ দেখে মনে হয়েছে জনাকীর্ণ ফুটপাথে আর কারো উপস্থিত সম্পর্কেও ওরা খুব সচেতন নয়—আনন্দে ওরা এক বিচ্ছিন্ন জগতের পথ ধরে চলেছে। আর একটা কথাও মনে পড়ল। প্রথম কলেজে ঢোকার পরে শনিবারের ভিড়ে বাড়ি ফেরার ধকলের কথা উঠতে অবন্তী বলেছিল, শনিবারে কলেজ ছুটি হলে বেশির ভাগ রাস্তা ওরা হেঁটেই মেরে দেয়। ওরা বলতে হাঁটার অন্য দোসর কে সেদিন বুঝি নি, আজ খুব স্পষ্ট।…পল্লব দত্তকে নিয়ে আমার প্রথম খটকা লেগেছিল অবন্তীর হায়ার সেকেণ্ডারির বছরে ওর মায়ের ক্লাবের চ্যারিটি শো রক্তকরবী দেখতে গিয়ে—নন্দিনীর রোলে

অভিনয় করে অবন্তী সোনার মেডেল পেয়েছিল। সেই শো'য়ে পঁচিশ টাকা টিকিটের প্রথম সারিতে ওই ছেলেকে দেখার পর—এর আগে অবন্তী নিজেই কবুল করেছিল, হালের অ্যাডমায়ারার একজন বড় জাতের শিল্পী ওর 'অবন্তী' নামের খুব প্রশংসা করেছিল।

…এরপর আর একদিন ওদের তুজনকে আউট্রাম ঘাটের দিকে হাত ধরাধরি করে বেড়াতে দেখেছি। স্ত্রী আর তুটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়াকে নিয়ে আমারও বেড়ানোর উদ্দেশেই আসা। স্ত্রীরও চোখে পড়তে আমার দিকে ঘুরে তাকিয়েছে। আমি চুপচাপ গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়েছি।

বাড়ি ফিরে ঘণ্টা তুই নিজের কর্তব্য ভেবেছি। যে কর্তব্যের কথা মনে আসছে তা করতে হলে আমাকে কঠিন হতে হয়। রাত সোয়া দশটার পর ফোন করে ওরই গলা পেলাম।

—ঘরে আর কে আছে ?

থমকালো একটু মনে হলো। গলা চেপে জবাব দিল, মা আর ছোড়দা… কেন ?

—কেউ যখন থাকবে না, আমাকে একটা ফোন করিস—

লাইন কেটে দিলাম। আরো মিনিট কুড়ি বাদে আমার ফোন বাজল। সাড়া দিতে ওদিক থেকে অবন্তীর গলা।—কি ব্যাপার বলো তো কাকু, আমাকে যে খুব ঘাবড়ে দিয়েছ !

—ঘাবড়ে দিতে পেরে থাকলে ভালো…তুই তাহলে তোর অ্যাডমায়ারার আর জাত শিল্পী পল্লব দত্তর মনের নাগাল পেয়ে গেছিস ?

গলার স্বর উদ্‌গ্রীব একটু, হঠাৎ এ-কথা ?

—গত শনিবারে দেখলাম পার্ক সার্কাস ময়দানের দিক থেকে তোরা তুজন গল্প করতে করতে ফিরছিস—আমি তোদের পাশ দিয়েই ড্রাইভ করে ফিরলাম।

—শনিবারে তো তিন বছর ধরেই অনেকটা পথ আমরা ও-রকম হেঁটে

ফিরি—দেখেও আমাদের তুলে নিলে না ?

—না। আর আজ বিকেলে আউট্রাম ঘাটের দিকে গিয়ে দেখলাম তোরা হাত ধরাধরি করে বেড়াচ্ছিস···

—তাই নাকি। তোমার সঙ্গে আর কে ছিল ?

—তোর কাকিমা আর তার দুজন আত্মীয়া।

—কি লজ্জা, দেখে তোমরাই পালালে বুঝি ? তরল হাসি।

—আমার কথার এটা জবাব হলো না।

—কি কথার···ও মনের নাগাল পেয়েছি কি না ? তা অনেকটা পেয়েছি ধরে নিতে পারো।

—এবারে তাহলে আমার দিক থেকেও কিছু কর্তব্য আছে তোর মনে হয় না ?

অবাক মনে হলো একটু।—তোমার দিক থেকে আবার কি কর্তব্য ?

—তোর বাবা-মাকে জানানো ?

চুপ একটু। পরের জবাব নিরুত্তাপ কিন্তু কঠিন।—জানানোটা খুব বড় কর্তব্য মনে করলে আমি আর বাধা দেবো কেন···তবে আমার মতে আর কিছুদিন অপেক্ষা করা যদি সম্ভব হয়, ভালো হয়।

—কেন ?

—দু'দিন আগে হোক পরে হোক বাড়ির লোক জানবেই, কিন্তু এক্ষুনি জানলে বাড়ির অশান্তিতে আমার সামনের ফাইনাল পরীক্ষাটা পণ্ড হবে।

—কিন্তু তোর কি আর ভাবার কিছুই নেই ?

—সে-কথা তো তুমি জিগ্যেস করো নি কাকু, আমি বয়ে যাচ্ছি ধরেই নিয়েছ···ছাড়লাম, অসুবিধে হচ্ছে।

রিসিভার নামানোর শব্দ। শেষের তিনটে কথা খুব চাপা। বুঝলাম ঘরে লোক এসেছে।

এই ফোনের পর আপাতত কর্তব্য চিন্তা ছেড়েছি। কিন্তু অস্বস্তি বাড়-ছিলই।

…পল্লব দত্তর মধ্যে বড় অভিনেতা হবার মতো প্রতিশ্রুতি থাকতে পারে। চেহারাও শতেক জনের মধ্যে চোখে পড়ার মতো। অবন্তীর মতো মেয়ে এটুকুতেই ভুলে ভবিষ্যৎ-সংকটের চিন্তা বাতিল করে চলেছে? আমার চিন্তায় সংকটটাই বড় হয়ে উঠছে।…তাছাড়া পল্লব দত্তর মতো অমন রূপবান ছেলের এই কালো মেয়ের প্রতি এত আকর্ষণ কেন? অবন্তী কালো হলেও সুশ্রী বটে। কিন্তু গায়ের রং দিয়েই তো এ-দেশে মেয়েদের রূপের বিচার। অবন্তীর ঐশ্বর্য দেখলে অবশ্য ভিন্ন কথা। কিন্তু তা দেখার মতো চোখ ওই কন্দর্পকান্তি ছেলের আছে, এ কেন যেন আমার মনে হচ্ছে না। মেয়ে-পুরুষের মনস্তত্ত্বগত আর একটা সম্ভাবনা আমার মনে বেশি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কোথায় যেন পড়েছিলাম, কালো মেয়েরা অনেক সময় খুব ফর্সা রূপবান ছেলের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়, আর সে-রকম ফর্সা রূপবান ছেলেদেরও নাকি কালো অথচ সুশ্রী মেয়ের দিকেই বেশি চোখ পড়ে। আমার আশংকা, পরস্পরের প্রতি এটাই বড় আকর্ষণের কারণ হলে দুজনারই মোহভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগবে না।

একটি ছেলে আর একটি মেয়ের প্রণয়ের ব্যাপারটা বেশিদিন কখনোই চাপা থাকে না। এই প্রণয় প্রহসন লোকের চোখে পড়তে বা তার সৌরভ ছড়াতে বেশি সময় লাগে না বলেই জানি। অবন্তী মিত্র (তখন মিত্র) আর পল্লব দত্তর ব্যাপারটা এত দিন ধরে এমন সংগোপন ছিল কি করে সেটাই আশ্চর্য।

প্রকাশের আলোয় এলো যখন, অবন্তীর বাড়ির মানুষদের রক্তে আগুন। বি. এ.-তে বেশ ভালো অনার্সই পেয়ে অবন্তী তখন য়ুনিভার্সিটিতে এম. এ. পড়ছে। হয়তো বা অবন্তীই চেয়েছিল এবারে জানা-জানি হোক।

ওদের প্রকাশ্য মেলামেশা এই কারণেই হয়তো বাড়ছিল। · প্রথমে ওর দুই দাদার চোখে পড়েছে। বড়দা অভিজিৎ বড় চাকরিই করছে এখন। আর ছোড়দা রণজিৎ সবে ডাক্তার হয়ে হাউস স্টাফের হাতে-খড়িতে নেমেছে। খবরটা অভিজিতের কানে কেউ তুলে থাকবে। তার-পর একটু খোঁজ নিতে দেখা গেল পাড়ার লোকেরা যতটা না জানে বে-পাড়ার লোকেরা তার থেকে ঢের বেশি জানে। অনেকেই অনেক দিন ধরে দুজনের অন্তরঙ্গ মেলামেশা দেখে আসছে। ছোড়দা রণজিতের চেনা-জানা অনেকের ভাই বা বোন য়ুনিভার্সিটিতে পড়ছে। তাদের তো অনেকেই জেনে বসে আছে অবন্তী মিত্রর সঙ্গে পল্লব দত্তর বিয়ে হবে। পল্লব দত্ত যে নাম-করা অভিনেতা হয়ে উঠছে, আর অনেক পেশাদার প্রতিষ্ঠান থেকেও তার ডাক পড়ে এ-ও তো তাদের অনেকেই জানে। অভিজিতের ডালহৌসিতে অফিস, পল্লব দত্তরও তাই। চেষ্টা করলে কারো না কারো চেনা লোক বার করতে কতক্ষণ? এই চেষ্টা করতে গিয়ে অভিজিৎ আরো তাজ্জব আরো ক্রুদ্ধ। পল্লব দত্তর অফিসসুদ্ধ লোক জানে তাদের এক-নম্বর অভিনেতার প্রেয়সী এবং ভাবী বধূটি কে।

নিঃসংশয় হবার পর দু'ভাই বাড়িতে সাতখানা হয়ে ফেটে পড়েছে। অবন্তী কিছুই অস্বীকার করেনি। বলেছে এম. এ-টা হয়ে গেলে তাকেই বিয়ে করবে। দুই দাদারই সমস্ত আক্রোশ তখন মায়ের ওপর।—খুব আস্কারা দাও, নাচ-গান-থিয়েটারে নামিয়ে মেয়েকে খুব আধুনিক বানাও—একটা লোফারের সঙ্গে কিনা···ছি ছি ছি, শোনার পর থেকে লজ্জায় তাদের মাথা কাটা যাচ্ছে।

অবন্তীর ঠাণ্ডা প্রশ্ন, কেন, সে তোমাদের থেকে কিসে ছোট, কোন্ গুণে কম?

দু'ভাই একসঙ্গে গর্জন করে উঠেছে, ওই লোকের স্বভাব চরিত্র তোর জানা আছে?

—তোমাদের এ-ধারণা কি করে হলো যে কিছু না জেনে না বুঝেই আমি এতটা এগিয়েছি ? গত তিন বছরের মধ্যে তোমরা তার স্বভাব চরিত্রে কে কি গলদ দেখেছ স্পষ্ট করে বলো।

…অবন্তীর মা কান্নাকাটি করে শয্যা নিয়েছে। ডাক্তার বাবা শোনা মাত্র প্রথমে জ্বলে উঠেছেন। পরে বে-গতিক দেখে অনুনয়ের রাস্তা ধরে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। না পেরে তিন গুণ ক্রুদ্ধ অথচ অসহায়।

পথ না পেয়ে স্বামী-স্ত্রীতে আমার বাড়িতে এসে হাজির, আমি যদি চেষ্টা করে মেয়েকে ফেরাতে পারি।

আমি অনেক চেষ্টা করেছি অনেক বুঝিয়েছি শুনে তাঁরা দুজনেই অবাক। ডাক্তারের ভ্রূকুটি, তার মানে আপনি অনেক দিন ধরেই ব্যাপারটা জানেন অথচ আমাদের কিছু বলেন নি বা বলার দরকার মনে করেন নি ?

ভদ্রলোকের কথার ধরন রূঢ়, মেয়ের চিন্তায় বিপন্ন ধরে নিয়েই গায়ে মাখি নি। বললাম, মেয়ের দিকে সে-রকম চোখ রাখলে আপনাদেরও খটকা লাগতে পারত, নানা কারণে আমার শুধু সন্দেহ হয়েছিল… ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে সেটা বুঝেছি অবন্তীর বি. এ. ফাইনাল পরীক্ষার মাস কয়েক আগে।…আমি কিন্তু দস্তুরমতো রাগ করেছিলাম, আপনাদের জানানো কর্তব্য সে-কথাও বলেছিলাম। ও খুব ঠাণ্ডাভাবে জবাব দিয়েছে, জানানোর সময় হলে সকলেই জানবে, এখন জানাতে গেলে ওর বি. এ. পরীক্ষাটা পণ্ড হবে মাত্র তার বেশি কিছু হবে না।

এবারে আরো অসহিষ্ণু উদ্ধত গলায় ভদ্রলোক বলে উঠলেন, তবু আপনি আমাদের জানালেন না কেন—কেন নিজে আপনি এ-দায়িত্ব নিতে গেলেন ?

—আমি কোনো দায়িত্ব নিই নি। জানালে কি করতেন, অতবড় মেয়েকে ধরে ঠেঙাতেন ?

—যাই করি, আপনার আমাদের জানানো উচিত ছিল—আপনি কি

খবর রাখেন বেহালায় ওদের আদি বাড়ি, সেই ছেলেবেলা থেকে এত শয়তান যে নিজের বাপ-মায়ের কাছে পর্যন্ত ঠাঁই হয় নি—এখানে মামা-বাড়িতে পড়ে আছে আর বাঁদরামো করে বেড়াচ্ছে—অভিনয় করে মদ গিলে বেহুঁশ হয়ে বাড়ি ফেরে—ও একটা মদ্যপ লম্পট পাড়ার সকলে জানে আর আপনি জানেন না ?

ভদ্রলোক এত উত্তেজিত যে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা বৃথা। একটু অপমানিতও বোধ করছি। তাছাড়া বাপ-খেদানো মা-খেদানো ছেলে এটা জানা ছিল না। মদ্যপ আর লম্পট এই ধারণা থেকেই অবন্তীকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিলাম ! অবন্তী সেটা স্বীকার করে না, তাছাড়া বছর তিনকের মধ্যে ওই ছেলের আমি কোনো বেচাল লক্ষ্য করি নি। নরম গলায় বললাম, ডাক্তারদাদা বউদি, আপনারা বিশ্বাস করুন এ-রকম ব্যাপার ঘটুক আমি কখনো চাই নি আর এখনো চাই না—

ভদ্রলোক ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, চান না, চান নি অথচ আমাদের একবার জানানো দরকার মনে করেন নি—এখনো জেনে রাখুন এ-সব আমি বরদাস্ত করব না—এ আপনার ওই সস্তা নাটক-নভেলের ব্যাপার নয়—বুঝলেন ?

বুঝে আমার কান গরম। ভদ্রলোক উঠে হনহন করে দরজার দিকে এগোলেন। বিষণ্ণ অসহায় মুখে ডাক্তার-বউদি একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। নীরব আবেদনে যেন বলতে চাইলেন ওঁর মনের অবস্থা বুঝে আমাদের ক্ষমা করবেন। তারপর স্বামীর অনুগামিনী হলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় অবন্তী এলো। ওর সুশ্রী কালো মুখখানা রাগে গনগন করছে দেখেও আমি গম্ভীর। তপতপে গলায় বলল, বাবা কাল তোমাকে কত অপমান করে গেছে কাকু মায়ের মুখে শুনলাম। তোমাকে শুধু বলতে এলাম তোমার ওই অপমান আমার পিঠে চাবুক হয়ে পড়েছে—টাকার দেমাকে বাবা আর মানুষকে মানুষ ভাবে না বুঝলে ?

—বোস্। ঠাণ্ডা গলায় বললাম, আমার বা বাবার কথা থাক, তোর নিজের কথা বল্।

আমার খাটেরই আর একধারে বসল।—আমার আর কি কথা, বাবা স্পষ্ট বলে দিয়েছে অমন ছেলেকে বিয়ে করলে আমাকে ত্যাজ্যমেয়ে করবে, তার সঙ্গে এ-বাড়ির কারো কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

ওর মুখের দিকে চেয়ে আমার ভিতরটা টনটন করে উঠল। বললাম, সক্কলের অবাধ্য হয়ে অমন ছেলেকে তুই ছাড়ছিসই বা না কেন—তোর কৈফিয়ত কি?

—ছাড়ব!···কৈফিয়ত? তুমি বলো কি কাকু, বাবা দাদাদের মতো তুমিও এটা সাময়িক মোহ ভাবছ? কেবল ওর রূপে মুগ্ধ ভাবছ আমাকে?

—আরো কি ভাবতে হবে তাই বল্।

টানা চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।—তুমি অন্তত আমাকে এত খেলো ভেব না কাকু···আর রূপের কথাই যদি বলো, ওরই বরং আমাকে ছেঁটে দেবার কথা—ওর তুলনায় আমি কি?

এ-ব্যাপারে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কথা না তুলে চুপচাপ চেয়ে রইলাম।

অবন্তী একটু আবেগের সুরেই বলে গেল, ও যখন অভিনয় করে বা অভিনয়ের চিন্তায় ডুবে যায় বাইরের থেকেও ওর ভিতরের রূপ আরো কত সুন্দর হয়ে ওঠে তুমি জানো না কাকু। আর ওর ভিতরটা তখন যেন বিশাল এক সমুদ্র হয়ে ওঠে—এমন যে আমিই তলকূল পাই না।

এই উচ্ছ্বাস একটুও মেকি মনে হয় নি আমার। তবু জিগ্যেস করলাম, মদ খাওয়া ছেড়েছে?

থমকালো একটু। তারপর জবাব দিলো, তুমি যে-ভাবে খেতে দেখেচ সে-ভাবে আর খায় না সেটা সিওর জেনে রাখো। তবে বাড়িতে একটু আধটু খায় অস্বীকার করে না—কমাচ্ছে, আরো কমাবে কথা দিয়েছে। ···আচ্ছা ধরো কাকু, মদ একেবারে ছাড়তে পারল না, তাতে কি হলো?

আঙুল তুলে আমার কাঁচের আলমারিটা দেখালো।—ওই তো তোমার আলমারিতেও একটা বোতল, যখন ক্লান্ত লাগে বা ইচ্ছে হয় একটু-আধটু খাও, সারাদিনের পরিশ্রমের পর বাবা ফিরে এলে মা নিজের হাতে তার মাপ মতো ঢেলে দেয়—একতলার ঘরের দরজা বন্ধ করে দাদা আর ছোড়দা তো প্রায়ই খায়, তারপর অকারণে হাসাহাসি ঠাট্টা তামাশা করে—এই একজনও যদি সমস্ত দিন অফিসের খাটুনি খেটে সন্ধ্যায় থিয়েটার করে ক্লান্তি দূর করার জন্য ঘরে বসে একটু-আধটু খায় তাহলে এত দোষের হবে কেন ?

আমি চুপ। আপ্ত বাক্য মনে পড়ছে, নিজের আচরণ দিয়ে অন্যের আচরণ শুধরোবে।

অবন্তীর গলা সামান্য চড়ল, বাবা আর দাদারা ওকে লোফার বলে, তুমিও হয়তো তাই ভাবো—ধরে নিলাম একসময় সে লোফারই ছিল—কিন্তু সারা জীবন ধরে তাই থেকে যাবে এটা ধরে বসে থাকার কারণ কি ? আমার ওপর কারো এতটুকু বিশ্বাস নেই কেন ? দস্যু মদ্যপ লম্পট প্রাচেৎস্ বাল্মীকি হয় নি ? গিরিশ ঘোষ গিরিশ ঘোষ হয় নি ?

লক্ষর মধ্যে কোটির মধ্যে ক'জন হয় এ প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। বললাম, শুনলাম বাপ-মা পর্যন্ত নাকি পল্লবকে নিজের কাছে রাখে নি—মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে বেঁচেছে ?

রাগের হাসি বুঝতে অসুবিধে হয় না। বিতৃষ্ণ হাসিও বলা যেতে পারে। —তাহলে দ্যাখো কি থেকে কি রটে। দাদারা বাবা-মাকেও এই কথাই বলেছে। ওর দাদুর নিজের ছেলে নেই, একটাই মাত্র মেয়ে—মায়া বলতে তাঁর ভাইয়ের ছেলেরা—জয়েন্ট ফ্যামিলি। একমাত্র ঘরের এই নাতি জন্ম থেকেই দাদু-দিদিমার চোখের মণি ছিল, সাত-আট মাস বয়স থেকেই নিজের বাবা-মাকে ছেড়ে এই দাদু-দিদিমার কাছে কত থেকেছে ঠিক নেই—যত বড় হয়েছে দাদু-দিদিমার কাছে থাকা অতো বেড়েছে। শেষে

তার আর একটি ভাই হতে দাত্ন দিদিমাকে আর আটকানো যায় নি —এই ছেলেকে পাকাপাকিভাবে নিজেদের কাছে এনে রেখেছে। সে কলেজে পড়তে দাত্ন মারা যায়, দিদিমা মারা যায় তারও অনেক পরে। ফলে তাকে এখানেই থাকতে হয়েছে।···গত এক বছরের মধ্যে তার নিজের বাবা-মা দুজনেই মারা যেতে এখন সে মামা বাড়ি ছেড়ে বেহালায় নিজের বাড়িতে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে থাকে—সে খবর কেউ রাখেও না, আগের খবরই ধরে বসে আছে।

—এ-কথা তুই বাড়িতে বলেছিস ?

—কাকে বলব, কেন বলব ? আমার কাছ থেকে কেউ কিছু শুনতে চেয়েছে ? রাগে টানা চোখ দুটো ঝকঝক করছে।—আরো শুনবে ? তাকে নাকি মেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে সব—তুমিও দেখেছ বলেছিলে—তার চেহারা ভালো,, কথাবার্তা ভালো, ভালো অভিনয় করে, এমন লোকের কাছে মেয়েরা যদি এগিয়ে আসে ক'জন বিবেকানন্দ হয়ে বসে থাকবে ? দাদা কত মেয়ের পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছে সে-খবর আমি রাখি না ? এখন সে বড় চাকরি করে বলে সবাই সব ভুলেছে—ন'মাস আগে এক ক্রিশ্চিয়ান মেয়েকে ঘরে আনতে চেয়েছিল বলে মায়ের সঙ্গে কুরুক্ষেত্র হয়ে গেছে—সে-ই ঢাক তোমার কাছে এসে পিটিয়েছে ? ছোড়দা তার এক নিচের এক ক্লাস ডাক্তার মেয়েকেই বিয়ে করবে তুমি দেখে নিও—আমাদের সঙ্গেই পড়ে একটি মেয়ের বড় বোন—বাড়িতে সে বলেই দিয়েছে তার বিয়ে একজনের সঙ্গে ঠিক হয়ে আছে, তাই তার জন্য ভাবনার কারণ নেই—ছোট বোনের বিয়ে দাও। যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক সে এই ছোড়দা—বুঝলে ? কিন্তু আমি কখনও কার বেলায় কি বলতে গেছি ?

পরের তিন-চার মাসের মধ্যে অবন্তী আর আসে নি। ইচ্ছে থাকলেও আমিই বা তার খবর নিই কি করে। ওর বাবার সেই ব্যবহারের পর আমার

আর নাক গলানোর রুচি নেই। কিন্তু অবন্তীর দিক থেকে কোনোরকম সাড়াশব্দ নেই কেন? ও কি আমাকেও শত্রুপক্ষের একজন ভেবে নিল···।

চার মাসের মাথায় একটা চিঠি পেলাম। বম্বের ছাপ মারা খাম। চেনা-জানা কত লোকই তো আছে সেখানে, কিন্তু নাম-ঠিকানা দেখে হাতের লেখাটা চেনা লাগল না। খুলে দেখি অবন্তীর চিঠি।

খুব আগ্রহ নিয়েই দু'বার করে পড়ে ফেললাম।

খুব অবাক হবার মতো চিঠি কিছু নয়।

···বাড়ির হামলা অসহ্য হয়ে উঠতে ও আর পল্লব দু'মাস আগে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছে। আর তার পনেরো দিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়েছে। না, কাউকে কিছু গোপন করে নি। সকলকে জানান দিয়েই পল্লবদের বেহালার বাড়িতে চলে এসেছে। বাবা আর দাদারা রাগে ফুঁসেছে—বাবার থেকেও দাদারা চার গুণ বেশি। লিখেছে, কেবল মায়ের জন্য বড় দুঃখ হয় কাকু, আমি মায়ের মন বুঝি, মা-ও আমার মন বোঝে—কিন্তু করার কিছু নেই।

···পল্লব তিন মাসের লম্বা ছুটি নিয়েছে। চাকরি দু'চক্ষের বিষ। তার মাথায় অনেক প্ল্যান। অবন্তীর তাতে সম্পূর্ণ সায় আছে লিখেছে। কলকাতায় ফিরে আর চাকরি করবে না, কোনো এক পেশাদার মঞ্চে ঢুকবে এবং দু একটা ভালো অফারও আছে। তার প্ল্যান সফল করতে হলে অনেক টাকা দরকার। চাকরি করে বা অফিস ক্লাবে-ক্লাবে থিয়েটার করে সে-টাকা কোনোদিন জমবে না। লিখেছে, তার দেওর কালু চমৎকার ছেলে, ওরই সমবয়সী, এক ভালো ফ্যাক্টরিতে টেকনিসিয়ান হয়ে ঢুকেছে। ওদের প্ল্যান শুনে তারও খুব উৎসাহ। সে বলেছে, দাদা তার প্ল্যান-মাফিক এগিয়ে যাক, আর টাকা জমাক, ততদিন সংসার চালানোর দায়িত্ব তার। মাসখানেক হলো তারা বম্বেতে বেড়াতে এসেছে। অবন্তীরও ইচ্ছে সে কলকাতায় ফিরে একটা চাকরি যোগাড় করতে চেষ্টা করবে,

কিন্তু পল্লবের তাতে ভীষণ আপত্তি—তার ধারণা সে পেশাদার মঞ্চে একটু জাঁকিয়ে বসতে পারলে অবন্তীকেও অভিনয়ে টেনে নিতে পারবে। আর এটা তাদের ভবিষ্যতের প্ল্যানের সঙ্গে মেলেও।

…বম্বেতে পল্লবের চেনা-জানা কলকাতার কিছু ভক্ত আছে। এদের মধ্যে একজন এখানকার সিনেমার এক নাম-করা ক্যামেরাম্যানের প্রধান সহকারী। পল্লবকে দেখে সে খুশিতে আটখানা। তার ভবিষ্যদ্বাণী, এই চেহারা আর অভিনয়গুণে একটু ধৈর্য ধরে চেষ্টা করলে এখানকার ফিল্ম-ওয়ার্লড-এ খুব তাড়াতাড়ি একজন স্টার হয়ে যাবে—কলকাতার বিখ্যাত মঞ্চাভিনেতা বলে পরিচয় দিয়ে পল্লবকে একজন প্রোডিউসারের কাছে নিয়েও গেছল। চেহারা দেখে আর কথাবার্তা বলে সেই প্রোডিউসার তাকে একটা মাঝারি রোলে চান্স দিতে চেয়েছিল। অবন্তী লিখেছে, টাকা জমানোর তাগিদে তোমাদের জামাই প্রায় রাজি। আমি বললাম, তাহলে আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। জানোই তো কাকু, আমার কাছে স্টেজের থেকে প্রিয় আর কিছুই না।

চিঠির শেষটুকু বড় সুন্দর। লিখেছে, কাকু, আর কেউ না করুক, তুমি আমাদের আশীর্বাদ কোরো। তোমাকেই শুধু চুপিচুপি একটা কথা বলি, এই দু'মাসের মধ্যে ও একদিনের জন্যও মদ ছোঁয় নি—আমার জুলুমে নয়, নিজে থেকেই। বলেছে চেষ্টা করে দেখি না কত দিন পারি। আরো একটা কথা, যদি পারো কোনো দুপুরে মা-কে একটা ফোন কোরো—বাবা যে ব্যবহারই করুক মায়ের তোমার ওপর বরাবরই খুব শ্রদ্ধা। যদি ফোন করো তো বোলো, তার মেয়ে খুব—খুব সুখী। বোলো, এই দুটো মাস আমার বুকের তলায় মস্ত দুটো কমল হীরের মতো ঝলমল করছে।

চিঠিটা পড়ে সত্যিই এত আনন্দ হয়েছিল যে মান অভিমান ভুলে ডাক্তার বউদিকে ফোন করেছি। ফোনে শোনা নয়, মেয়ের চিঠি পড়ার

জন্য কাউকে না জানিয়ে আমার বাড়ি চলে এসেছেন। মেয়ের চিঠি পড়ে কেঁদেছেন। তারপর ঝোঁকের মুখে বলেছেন, আমিও দেখব কত দিন ওর বাবা একটা মাত্র মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে পারে।

আবার মাস চারেকের মধ্যে ওদের কোনো খবর নেই। তারপর এক সন্ধ্যায় ওরা দুজনে এসে হাজির। পল্লব অবশ্য প্রথমে বাড়ি ঢোকে নি, ফুটপাথ থেকে ওকে ধরে আনতে হয়েছিল সে-কথা আগেই বলেছি। খুশিতে টলমলে মুখ দেখেছি অবন্তীর। গায়ের রং কালো হলেও আমার চোখে ও বরাবরই সুশ্রী। কিন্তু এত সুন্দর বোধহয় ওকে জীবনে দেখি নি। ...তির্যক চোখে বার কয়েক দেখে নিয়ে আরো কিছু মনে হয়েছে আমার। পরে স্ত্রী-ও আমার কথায় সায় দিয়েছে। সে এক ফাঁকে অবন্তীকে জিগ্যেসই করেছিল।

খুব শীগ্‌গির না হলেও অবন্তী মা হতে চলেছে।

প্রাথমিক আনন্দোচ্ছ্বাসের পর আমি বললাম, সেই বম্বে থেকে একটা চিঠি লিখেছিলি, এই চার মাসের মধ্যে তোদের আর কোনো খবরই নেই —ব্যাপারখানা কি ?

অবন্তী বলল, চার মাস না হোক, গত তিন মাস ধরে আমরা কি-যে ব্যস্ত ছিলাম কাকু তুমি ভাবতেও পারবে না, আজও একটা বোঝা-পড়া নিয়েই এসেছি, তুমি নিরপেক্ষ রায় দেবে কিন্তু।

কি নিয়ে বোঝা-পড়া শুনে আমি সত্যি খুব খুশি। এতবড় একটা গণ্ডগোল এত শীগ্‌গির মিটে আসবে ভাবিনি। সম্পূর্ণ মেটে নি অবশ্য, কিন্তু আমার আশা মিটে যাবে। এবং সেটাই স্বাভাবিক।

...ওরা বম্বে থেকে ফিরে আসার তিন সপ্তাহের মধ্যে ছোড়দা রণজিৎ ওদের বেহালার বাড়িতে এসেছে। খুব গম্ভীর মুখেই ওদের দুজনকে মায়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছে, আর বাবা অবন্তীকে ডেকেছে, ওর সঙ্গে নাকি তার দরকার আছে।

পল্লব যায় নি। অবন্তী একলাই গেছে। এত সুখের মধ্যেও একমাত্র মায়ের কথা ভেবেই তার দুঃখ। ডাকলে না এসে পারে কি করে? তাছাড়া অবন্তীর মনে মনে আশাই ছিল, দাদারা পারলেও বাবা-মা শেষ পর্যন্ত ছেঁটে ফেলতে পারবে না, রাগ পড়লে সম্পর্ক আবার সহজ হবে—এ রকম সে অনেক দেখেছে।

ও যেতে মা তো আনন্দে আটখানা, কিন্তু ভাঙলেও বাবার মচকানোর স্বভাব নয়। বাবা খুবই গম্ভীর, কিন্তু মায়ের মুখ চেয়ে অনেকটাই যে নরম তা-ও বুঝতে বাকি থাকে নি। দুই দাদার কাছেই কেবল নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হয়েছিল অবন্তীর।

···বিকেল চারটে নাগাদ সে চলে আসবে ভেবেছিল। আর বাবার গাড়ি করে তাকে বেহালা পৌঁছে দেবার প্রস্তাব কি করে নাকচ করবে ভাবছিল, তিনটের সময় বাবা ওকে ঘরে ডেকে পাঠালো। মাও উপস্থিত সেখানে। বাবার সামনে এক-তাড়া ফিক্সড্ ডিপোজিটের রিসিট, একটা ব্যাঙ্কের পাশ-বই আর একটা বড়সড় কাঠের বাক্স।

': বোস্।

বাবার কথায় অবন্তী খাটের কোণে বসল। ভিতরটা ওর তখন সত্যি-কারের বিপন্ন। সামনে যা-কিছু তার সবই অবন্তীর খুব চেনা। বাবা ওর বিয়ের জন্যে বছরে একটা দুটো করে মোটা টাকার ফিক্সড্ ডিপোজিট রাখা শুরু করেছিল অনেক বছর আগে থেকেই। মা-কে বলেছিল এক লাখ পর্যন্ত করবে। আরো বছর চার আগেই সেই অঙ্ক লক্ষ টাকায় পৌঁছে গেছে। ওই পাশ-বইও অবন্তীর নামেই। ফিক্সড্ ডিপোজিটের ইণ্টারেস্ট বছরে দু'বার করে ওই পাশ-বইয়ে জমা পড়ে। অবশ্য সেই দিনের ফিক্সড্ ডিপোজিটের সুদের হার এত ছিল না। পাশ-বইটা খুলে বাবা দেখালো সেই গোড়া থেকেই শুরু করে পাশ-বইয়েও উনষাট হাজার কয়েকশ টাকা সুদ জমা হয়েছে। ফিক্সড্ ডিপোজিটের রিসিট

গুলো আর পাশ-বইটা বাবা তার দিকে ঠেলে দিলো, বলল, এ সব নিয়ে যা, যাকে দেবো বলে রেখেছি তাকে বঞ্চিত করতে চাই না, আর তোর মা কি রেখেছে ছাখ্, ওগুলো সাবধানে নিয়ে কোনো লকারে রাখতে হবে— এখন পর্যন্ত লকার-টকার কিছু নেই বোধহয় ?

অবন্তী মৃদু জবাব দিলো, জানি না।

ওই কাঠের বাক্সে কি আছে অবন্তী তা-ও জানে। স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই একটু একটু করে মা ওর জন্য সোনার গয়না বানানো শুরু করেছিল। এখন কম করে পঞ্চাশ ভরি সোনার গয়না আছে ওতে। এগুলোও এখানকার ব্যাঙ্কের লকারে ছিল, ও আসবে বলেই ব্যাঙ্ক থেকে এনে রাখা হয়েছে অবন্তীর সেটা বুঝতে অসুবিধে হলো না।

বড় একটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলতেই হলো অবন্তীকে। বলল, বাবা-মা, এ-সব কিছু এখন নেবার অধিকার আর আমার নেই···কেন তা বুঝতে চেষ্টা করো, নিতে হলে এখন আর একজনের অনুমতি অন্তত নিতে হবে, লোভে পড়ে তাকে আমি অপমান করব এমন শিক্ষা তোমরা আমাকে দাও নি···।

বাবা তক্ষুনি রেগে গেল। বলে উঠল, আমরা তোকে কোনো শিক্ষাই দিই নি, নিজের শিক্ষাতেই সব করেছিস—তোর নামে ফিক্সড্ ডিপোজিটের রিসিট, তোর নামে ব্যাঙ্কের পাশ বই—এ-সব তো ইচ্ছে করলেও আমি ভাঙাতে পারব না !

ঠাণ্ডা মুখে অবন্তী জবাব দিয়েছে, দাদাদের এনক্যাশমেণ্টের আর উইথ-ড্রয়ালের কাগজ-পত্র এনে রেডি রাখতে বোলো, আমি আর একদিন এসে সই করে দিয়ে যাব—ভাঙিয়ে নিয়ে যার নামে হয় রেখো।

এরপরেই সচকিত। বাবাকে এমন ঝাঁঝিয়ে উঠতে আর এই সুরে কথা বলতে মা-কে কোনোদিন দেখে নি বা শোনে নি। তপতপে গলায় মা বলে উঠল, নিজে শুনলে তো ? শুনেছ ভালো করে ? ও কি বলল ছেলে-

দেরও ডেকে এনে শোনাও এখন! তুই ঠিক করেছিস অবু, খুব ভালো করেছিস—বুঝলি? ভালো করে চিনুক সব! ওঁর আর তোর দাদাদের ধারণা আহ্লাদে আটখানা হয়ে সব নিয়ে যাবি—নিয়ে গিয়ে বাঁচবি—এখন? এখন কি হলো? নিলো কি নিলো না দেখলে? আমার কথা ঠিক হলো কি না দেখলে?

বাবার এমন ফ্যাকাশে মুখ অবন্তী কখনো দেখে নি, তবু অভ্যাস মতো মাকে ধমকেই উঠল, চেঁচিয়ো না—থামো! একটু গুম হয়ে থেকে মেয়ের দিকে তাকালো, বলল, পাঁচজনের মুখে পাঁচ রকম শুনে হঠাৎ কত বড় একটা ধাক্কা খেয়ে আমি ও-রকম ব্যবহার করেছি এটা তো মনে হলো না—তোর দাদাদের থেকেও তোকে আমরা বেশি ভালোবাসতাম কিনা তুই জানিস না?···তুই তাহলে এখন আমাকে এ-ভাবে আক্কেল দিবি, এ-ভাবে অপমান করবি? আমার দেওয়া জিনিস তুই ছুঁবি না?

অবন্তী ফাঁপরেই পড়েছিল একটু। বলেছে, বাবা, এ-রকম বলে তুমি আমাকে মুশকিলে ফেলছ।···তোমার জামাই যদি সত্যি অমানুষ হয় তাহলে এত টাকা এত গয়না দেখে খুশি হবে—আর অমন অমানুষ যদি না হয় তো এই টাকা আর গয়নার সঙ্গে আমাকে সুদ্ধ তোমাদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবে এটুকু বুঝতে পারছ না?

বাবা এতেও অসহিষ্ণু।—তাহলে তুই দয়া করে আমাদের হয়ে তাকে একটু বুঝিয়ে বল্—মেয়ের দুশ্চিন্তায় বাবা-মা পাগল হয় কিনা এটা তাকে জিগ্যেস কর! আমি কি তোকে দয়া করতে যাচ্ছি? আমাদের ভুলই যদি হয়ে থাকে বাপ-মায়ের আশীর্বাদটুকুও সে তোকে নিতে দেবে না?

অবন্তী তাড়াতাড়ি বলেছে, আচ্ছা বাবা, আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করব, এ নিয়ে তুমি এখন কিছু ভেব না।

এর দু'দিনের মধ্যে বাবা-মা দুজনেই গাড়ি করে তাদের বেহালার বাড়ি

এসেছে। গাড়ি বোঝাই ফল মিষ্টি এনেছে। অমন ছোট্ট তিন ঘরের বাড়ি তাদের কারোই পছন্দ হয় নি সেটুকু অবন্তী অন্তত বুঝেছে। সে-যাক, বাবা-মায়ের সঙ্গে জামাইয়ের মোটামুটি একটু বোঝাপড়া হয়েছে। পরের রবিবার জামাই তাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করেছে। ফিরে এসে অবন্তীকে ঠাট্টা করেছে, তোমার বাবা-মা তোমার টানে আমাকে টেনেছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু তোমার দাদাদের সামনে আমার একেবারে জেলখানার কয়েদীর দশা—বাব্বাঃ, আর না।

টাকা আর গয়না নেবার ব্যাপারে পল্লবের সাফ—না। কিন্তু অবন্তীর যুক্তির কাছে তার যুক্তি টেকে নি। বাবা মায়ের আশীর্বাদ শুধু নয়, ঈশ্বরেরও আশীর্বাদ। টাকা জমানোর অপেক্ষায় না থেকে এই টাকার জোরে এক্ষুনি তারা নিজেদের নাট্যগোষ্ঠী করতে পারবে। দু'মাসের পরিশ্রমে অনেকটাই এগিয়েছে। প্রথম বই বাছা হয়েছে কৃষ্ণকান্তের উইল আর বিষবৃক্ষ। নায়ক-নায়িকা বাদে অন্য আর্টিস্টও ঠিক হয়ে গেছে। কলকাতায় কোন্ সময় কোন্ কোন্ হল্ পাওয়া যাবে ঠিক করে কিছু কিছু টাকা অ্যাডভান্সও করা হয়েছে। ড্রেস আর অন্যান্য সরঞ্জামও অল্প অল্প করে কেনা হচ্ছে। একটা ঘর না পাওয়া পর্যন্ত রিহারসাল আপাতত বাড়ির একখানা ঘরেই হবে। তবে ঘরও শীগ্‌গিরই পাওয়া যাবে আশা করা যায়। এখন নাট্যগোষ্ঠীর নাম রেজিস্ট্রি করে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। নইলে বাইরে থেকে কল্-শো'য়ের ডাক আসবে কি করে—শহরের লোকই বা জানবে কি করে। এই প্রচারের কাজ অনেক আগে থেকে শুরু করা দরকার। এখন ঘরের লোক আর দেওরের সঙ্গে গোষ্ঠীর নাম নিয়েই খটাখটি লেগেছে। অবন্তীর ইচ্ছে নাম হোক, পল্লব নাট্যগোষ্ঠী —কালে দিনে বেশ ডাল-পালা ছড়িয়ে পল্লবিত হবে। কিন্তু দু'ভাইয়ের একজনেরও এ নামে সায় নেই।

জিগ্যেস করলাম, ওরা কি নাম চায়?

গম্ভীর মুখে পল্লব জবাব দিলো, এই নামও একটু টেনে বাড়িয়ে আপনারই বলতে পারেন। আমি আর কালু বলছি নাম হবে 'অবন্তিকা'।
আমি বলে উঠলাম, এর থেকে ভালো নাম আর কিছু হয় না—ফার্স্ট ক্লাস!
অবন্তী পলকা রাগের সুরে বলে উঠল, তুমি তো বলবেই, এই জন্যেই ও ফাইনাল ডিসিশনের জন্য তোমার কাছে এসেছে—কেন পল্লব নাম কি খারাপ?
—খারাপ নয়, তবে অবন্তিকা ঢের বেশি আর্টিস্টিক।
পল্লব স্ত্রীর দিকে তাকালো—কি বলেছিলাম?
গোষ্ঠীর নাম সম্পর্কে পল্লব আর কোনো কথাই তুলতে দিলো না। ফাইনাল ডিসিশন হয়ে গেছে।
পরের আলোচনায় শুনলাম, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রথম কিছুকাল ওরা বিষবৃক্ষ আর কৃষ্ণকান্তের উইল করবে। নায়কের রোল তো বাঁধাই। কৃষ্ণকান্তের উইলে অবন্তী রোহিণীর রোলেই নামবে—কিন্তু বিষবৃক্ষে সে নাকি হীরা দাসী চরিত্র করবে। শুনে আমি অবাক একটু। বললাম, তোর মতো এমন একটা ভালো মেয়ে বিষবৃক্ষের মূল চক্রী আর ষড়যন্ত্রীর ভূমিকায় নামবে কি রে—আর রোলও তো ছোট!
অবন্তী হেসে জবাব দিলো, ছোট বড়তে কি আসে যায়, অভিনয় করার মতো চরিত্র বিষবৃক্ষে ওই একটাই—লেকচার দিয়ে দিয়ে তোমাদের জামাই আমাকে আধখানা হীরা দাসী বানিয়েই ফেলেছে!
পল্লবের মুখ দেখে ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু অবন্তীর উৎসাহের অন্ত নেই। গয়নায় হাত দিতে হবে না, বাবার দেওয়া এক লাখ ষাট হাজার টাকা মূলধন যেন আকাশ ফুঁড়ে হাতে এসেছে—উৎসাহ হবারই কথা। টাকা যোগাড় করে নিজেদের নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তুলতে কত বছর লেগে যেত ঠিক আছে। পল্লবের নাকি এই জন্যেই আবার সংকোচ, সে নাকি

অবন্তীকে বলেছে এই টাকা ধার হিসেবে নেবে। এই নিয়েও দুজনার ঝগড়া।

অবন্তীর দিকে চেয়ে আমি ভাবছিলাম আমার ধারণা যদি ঠিক হয়, অর্থাৎ ও যদি সন্তানসম্ভবা হয়ে থাকে তাহলে মঞ্চে নামার জন্য এত তোড়জোড় করছে কি করে। জিগ্যেস করলাম, তোদের প্রথম নাটক কবে হচ্ছে আর কোথায় হচ্ছে?

—ও-মা, সে এখন কি, নড়া-চড়া করে রাস্তা বুঝতেই দু'মাস কেটে গেল, এরপর স্ক্রিপ্ট্ হবে, যে আর্টিস্টদের সঙ্গে কথা হয়েছে ট্রায়েল নিয়ে তাদের রোল ঠিক হয়ে রিহারসাল হবে, আর্ট ডাইরেক্টর অ্যাপয়েন্ট করে সিন-সিনারির প্ল্যান ঠিক করতে হবে—লাইটিং-এর জন্য একজন এক্স-পার্ট টেকনিশিয়ান পাওয়াও কি সহজ কথা—পর্ব কি কম নাকি? সামনের বছরের মাঝামাঝি যদি শুরু করতে পারি তাহলে ভাগ্য বলতে হবে।

তার মানে আট ন'মাস দেরি এখনো। তাহলে অবশ্য খুব একটা সমস্যা হবার কথা নয়।

এর পরে যখন দেওর কালুকে নিয়ে অবন্তী আমার কাছে এসেছে, তার কোলে তিন মাসের এক ফুটফুটে মেয়ে। দেখে সকলেরই মনে হবে কালে দিনে এ মেয়ে রূপসী হবেই। দুধ-আলতা গায়ের রং, গালে আঙুল ছোঁয়ালে রক্ত এসে যায়। গায়ের রং বাপের থেকেও ফর্সা হতে পারে, কিন্তু আমার ধারণা মুখ মায়ের মতো হবে। মায়ের থেকেও মিষ্টি হবে।

কিন্তু মেয়ে নিয়ে আনন্দ করা বা দু'পাঁচ কথা বলারও সময় নেই অবন্তীর। একটা ছাপা কার্ড বার করে সামনে ধরল। অবন্তিকার উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কার্ড। আর ওমুক সাহিত্যিক অর্থাৎ আমি উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সভাপতি। মাঝে আর ছ'দিন বাকি।

বললাম, একবার জিগ্যেস করলি না, একেবারে আমার নাম দিয়ে বসে

থাকলি।

': হুঁঃ, তাহলে তোমাদের জামাইকেও জিগ্যেস করতে হয় অভিনয় করবে কি না। শোনো, আমাদের এখন মরার ফুরসত নেই, ও-দিকে চার দিন ধরে আহার নিদ্রা নেই, কালু ট্যাক্সি নিয়ে আসবে না। তুমি তোমার নিজের গাড়িতেই চলে যাবে ? অবশ্য নিজেদের গাড়িতে গেলেও কালুকে আসতেই হবে, নইলে খারাপ দেখায়—

ওর দেওরকে দেখতে নিরীহ গোছের, সুশ্রী হলেও অমন রূপবান দাদার সঙ্গে চেহারার তেমন মিল নেই। কিন্তু ভিতরে ছেলেটা বেশ রসিক মনে হলো। অবন্তীর দিকে চেয়ে গম্ভীর মুখে বলল, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে না দিয়ে তুমি যে ভাবে কালু-কালু করছ, উনি ভাবছেন তোমার বাড়ির চাকর-টাকর হবে।

': ও সরি কাকু, ইনি হলেন আমার মহামান্য দেওর কল্লোল দত্ত, আমার থেকে দেড় মাস ছোট, ঠাকুরপো না বলে কালু বলে ডাকলে গোঁসা হন, কিন্তু দাদার আড়ালে সর্বদাই আমাকে অবন্তী-অবন্তী করেন—আর আমি ফোঁস করে উঠলে বলেন, দেড় মাসের বড় মেয়েদের সঙ্গে আজকাল আকছার বিয়ে পর্যন্ত নাকি হচ্ছে—আর আমাকে জব্দ করার জন্য ও ওর থেকে কম করে এক বছরের বড় কোনো মেয়েকে বিয়ে করবে—আমার এই শ্রীল যুক্ত দেওর তোমাকে নিতে আসবেন।

কালুর গম্ভীর দু'চোখ আমার দিকে। মন্তব্যের সুরে বলল, রোহিণীর চরিত্রখানা প্রায় নিজের চরিত্র করে ফেলেছে, এরপর হীরা দাসী হলে কি হবে কে জানে।

': থাম্ ছোঁড়া ! আমার দিকে চেয়ে অবন্তী হেসে ফেলল।—কৃষ্ণকান্তের উইল পড়ে গোবিন্দলাল হয়ে ওর দাদার গলা নকল করে রোহিণী-রোহিণী করে আমাকে জ্বালিয়ে মারছে, আর এমন পাজি যে দাদাকে ছেড়ে ওর সঙ্গে রিহারসাল দিলেই নাকি আমার রোহিণীর গোপন

প্রেমের রোল্‌টা দারুণ উতরোবে—

ধমকের সুরে কালু বলে উঠল, কাকুর সামনে এ-সব কি হচ্ছে—অভিনেত্রী হবার আগেই মুখের লাগাম নেই, হবার পরে কি হবে ?

ধমক খেয়ে অবন্তী একবার ওর দিকে টেরিয়ে তাকালো, তারপর নিস্পৃহ মুখে উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে কালু দু'হাত তুলে নিজের মাথা চাপা দিলো, উচিত কথা বললেই কি হয় দেখুন কাকু, ও আমার মাথায় গাঁট্টা মারতে আসছে !

অবন্তী হেসে ফেলল।—বাড়ি চলো, তোমার হবে আজ। চলি কাকু, আর একটুও সময় নেই—

আমার স্ত্রীই ওকে জোর করে বসালো আবার। ওদের চা-জলখাবার রেডি। আমি বললাম, তুই তো থিয়েটার করে বেড়াবি, তোর মেয়ে দেখবে কে ?

': খুব ভালো একজন আয়া পেয়েছি কাকু, মায়ের মতো করে দেখে—খরচ অবশ্য অনেক, খাওয়া-দাওয়া বাদে মাসে দু'শ টাকা মাইনে—

': আর তোরা যখন কল্‌-শো-তে বাইরে যাবি ?

': আয়াও মেয়ে নিয়ে সঙ্গে যাবে···আর একটু বড় হলে সঙ্গে নেবারও দরকার হবে না—এখনই তো রাতে ওর কাকার সঙ্গে শোয়—মেয়ের জন্য রাতে ওকে তিন বার করে উঠতে হয়।

কালুর আবার গম্ভীর মন্তব্য, আমি চিনির বলদ।

অবন্তী সঙ্গে সঙ্গে মুখঝামটা দিলো, একটা বিয়ে করে যত খুশি চিনি খেলেই হয়—কে বারণ করেছে !

অবন্তীর মুখাখানা আগের থেকেও সাফাই হয়েছে দেখছি। কালু ছেলে-টিকে আমার সত্যি ভালো লেগেছে।

যাবার আগে অবন্তী বলে গেল, তোমাকে আর কাকিমাকে নেবার জন্য কালু ঠিক সময়ে আসবে···আর একটা কথা কাগজঅলাদের আমরা তো

নেমন্তন্ন করবই, তুমিও দেখো সকলে যেন যায়।

উদ্বোধন ভালোই হলো। আমার চেষ্টার ফলে কিছু কাজ হয়েছে, সব কাগজের তরফ থেকেই বিশিষ্টজনেরা এসেছে। এক মা ছাড়া অবন্তীর বাপের বাড়ির আর কাউকে দেখলাম না। শুভানুষ্ঠানের পর অবন্তিকার প্রথম অভিনয় কৃষ্ণকান্তের উইল দেখে সকলেই যথার্থ খুশি। গোবিন্দ-লালের ভূমিকায় পল্লব দত্ত ভালো অভিনয় করবে এ কাগজঅলারাও অনেকে জানত, কিন্তু রোহিণীর ভূমিকায় বিদিশা দত্ত এমন চমৎকার অভিনয় করবে কেবল আমি ছাড়া বোধহয় এ-ধারণা কারো ছিল না। প্রায় সব কাগজই এই নতুন গোষ্ঠীর উজ্জ্বল সম্ভাবনা ঘোষণা করেছে। অভিনয় মঞ্চে অবন্তী দত্ত শুরু থেকেই বিদিশা দত্ত।

এর পর থেকে যাত্রা শুরু। খুব নিরুদ্বিগ্ন যাত্রা বলা যাবে না। নতুন গোষ্ঠীর পক্ষে চট করে মাথা তুলে দাঁড়ানো সহজ মোটেই নয়। টেকনি-ক্যাল ত্রুটি-বিচ্যুতি গোড়ার দিকে থাকবেই। কলকাতায় ভালো হাউস জোটানো একটা বড় সমস্যা। কলকাতায় যত নাম হবে মফস্বল থেকে কল্‌-শোয়ের ডাক ততো বেশি আসবে। কিন্তু কলকাতায় ভালো হল্ পাওয়ার চেষ্টায় হাঁ করে বসে থাকতে হয়। আবার যাতয়াতের অসুবিধের জায়গায় হল্ পেলে তেমন লোক হয় না। নাম চালু রাখার জন্য লাভ-লোকসানের ব্যাপারে চোখ বুজে থেকেই শো চালিয়ে যেতে হয়। শো থাক না থাক, অন্য আর্টিস্ট আর টেকনিশিয়ানদের খরচ চালিয়ে যেতেই হয়। এর ওপর আর এক বিপদ আর্টিস্ট ছুটে যাওয়া নিয়ে। একটু ভালো অভিনয় করতে দেখলেই নামী গোষ্ঠীরা টাকার টোপ ফেলে তাকে ভাঙিয়ে নিয়ে যায়। আরো একটা অসুবিধের জন্য পল্লব বা অবন্তী কেউ প্রস্তুত ছিল না। কৃষ্ণকান্তের উইল বা বিষবৃক্ষে ভ্রমর বা কুন্দনন্দিনীর ভূমিকায় যে মেয়েটি কাজ করছিল সেই মেয়েটি বেশ সুশ্রী ছিল আর পল্লবের হাতে পড়ে দস্তুরমতো ভালো অভিনয় করছিল। বলতে গেলে দুটোতেই

নায়িকার ভূমিকা তার, সে জায়গায় অবন্তী অভিনয় করত নেগেটিভ রোলে। অথচ কুমন্ত্রণার ফলে হোক বা যে কারণেই হোক মেয়েটির ধারণা হলো স্বয়ং নাট্যাচার্যের স্ত্রী যেখানে অভিনেত্রী সেখানে তার ভবিষ্যৎ মোটে ভালো নয়, ফলে বেশ উপযুক্ত হয়ে ওঠার পর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিনী নেই এমন এক দলে চলে গেল।

এমনি বাধাবিঘ্ন মেনে নিয়েও অবন্তিকা গোষ্ঠী পিছু হটে নি। ঘরের টাকার জোরে অস্তিত্ব বজায় রেখে ধীর গতিতে এগিয়ে যেতেও পেরেছে। সুনামের সঙ্গে সঙ্গে সুদিনের মুখ দেখার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। পাঁচ ছ'বছরের মধ্যে এমন দিন এলো যখন খবরের কাগজ খুললেই বিজ্ঞাপনে অবন্তিকার নাম চোখে পড়ে। কলকাতায় হোক বা বাইরে হোক সপ্তাহের মধ্যে অনেক দিনই তাদের ঠাসা প্রোগ্রাম দেখে ভালো লাগত। না, অবন্তিকা গোষ্ঠীর অধ্যায়ে অবন্তী নামে কোনো অভিনেত্রীর অস্তিত্ব নেই। যে আছে সে বিদিশা দত্ত। কথায় কথায় একদিন জিগ্যেস করছিলাম, মঞ্চে অবন্তীকে বাতিল করে তুই বিদিশা হয়ে গেলি কেন?

পল্লবও সামনে ছিল। তাকে দেখিয়ে অবন্তী হেসে ঠাট্টার সুরে বলেছিল, ওই রূপের পাশে এই চেহারা নিয়ে কত দিন চালাতে পারব কে জানে, তাই আগে থাকতেই নিজের অদৃষ্ট ঘোষণা করে রাখলাম। কবে হারিয়ে যাই তার ঠিক আছে।

...পরিহাসের কথা শুনে ওপরঅলাও কি হেসেছিল?

...অবন্তীর সাড়ে সাত বছরের অভিনয় জীবনের প্রত্যেকটি নাটক দেখেছি। ওর করা প্রতিটি চরিত্র আমার মনে দাগ রেখে গেছে। দুর্গেশনন্দিনীতে ও আয়েষা পল্লব জগৎসিংহ, দেনা-পাওনায় ও ষোড়শী পল্লব জীবানন্দ, গৃহদাহে ও অচলা পল্লব সুরেশ, শেষের কবিতায় ও লাবণ্য পল্লব অমিট্ রে—একটাও মিলনান্তক নয়। একবারে নতুন নাটক খুঁজছে শুনে আমি বলেছিলাম, শরৎবাবুর দত্তা কর্ না। শুনেই অবন্তী নাক

সিঁটকেছিল, দূর দূর—ওর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আমার একটা ভ্যাদভ্যাদে াবয়ে ভালো লাগে না! এবপর আমি সত্যি অবাক হয়েছিলাম ওদের ম্যাকবেথের তর্জমা নাটক ম্যাকবেথ দেখে। অবন্তী অর্থাৎ বিদিশা দত্ত লেডি ম্যাকবেথ আর পল্লব দত্ত ম্যাকবেথ। বাইবে ঠাণ্ডা সংযত এই মেয়ে অভিনয়ে যে এমন নিষ্ঠুর হিংস্র হয়ে উঠতে পারে আমার কল্পনায় ছিল না। লেডি ম্যাকবেথই ওব জীবনের শেষ অভিনয় আব আমাব মনে হয় সব থেকে সেরা অভিনয়ও।

ম্যাকবেথের পরেই অবন্তিকার নাট্যমঞ্চে নতুন নায়িকার আবির্ভাব। ঊর্মিমালা রায়, ঊর্মি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন আর নতুন নায়িকার ফোটো দেখে বেশ অবাক হয়েছিলাম। বিজ্ঞাপনের ছবি দেখে নতুন নায়িকার রূপ-যৌবন একটা বড় আকর্ষণ হবে এটুকু বোঝা গেছল। কিন্তু সাত সাড়ে সাত বছর বাদে শুধু এ-জন্যেই অবন্তিকার প্রতিষ্ঠাত্রী অবন্তী তথা বিদিশা বসে যাবে এ তো ভাবা যায় না।

অনেক দিন আগে আমি যে পরামর্শ দিয়েছিলাম সেই নাটকই হচ্ছে। শরৎবাবুর বিজয়া। এত সাফল্যের সঙ্গে যারা ম্যাকবেথ নামিয়েছে তারা হঠাৎ আবার এই পুরনো নাটকের দিকে ঝুঁকবে ভাবি নি। তবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বড় প্রতিষ্ঠানকে নাটকের পুঁজি বাড়াতেই হবে। মফস্বলে বিজয়া যত চলবে ম্যাকবেথ বা শেষের কবিতা ততো চলবে না, ঐতিহাসিক নাটক তুর্গেশনন্দিনী যত চলবে ওথেলো ততো চলবে না। সব-দিকে চোখ রেখেই পেশাদার প্রতিষ্ঠানকে শাশ্বত আবেদনের নাটক মঞ্চস্থ করতেই হয়।

প্রত্যেক নাটকের শুভানুষ্ঠানের দিনে আমি অবন্তী দত্তর নাম-ছাপা আমন্ত্রণ পেয়ে থাকি। এবারো তার ব্যতিক্রম হয় নি। গেছি। কিন্তু গণ্যমান্য অতিথিদের জন্য যারা দাঁড়িয়ে তাদের মধ্যে অবন্তীকে দেখলাম না। ভাবলাম ভিতরে আছে। খবর নিয়ে শুনলাম ভিতরেও নেই। পল্লবের সঙ্গে দেখা হতে সে হাসিমুখেই জানালো, অবন্তীর শরীর খারাপ তাই আসতে পারল না, একটি নতুন মেয়ে পেয়ে গেলাম, আশা করছি ভবিষ্যতে তার কদর হবে···কিন্তু বড় কিছু এক্সপেরিমেণ্টাল রোলে তো

গোড়াতেই নামিয়ে দিতে পারি না, অবন্তীই পরামর্শ দিলো ওকে নিয়ে বিজয়া করে দেখো সহজ হবে, ভালোও হবে মনে হয়। পল্লবের মনে আছে, হেসেই আবার বললে, আপনি তো অনেক আগেই বিজয়া সাজেস্ট করেছিলেন, এখনো বিজয়ার রোল ওর পছন্দ নয়, তাই একে ট্রায়েল দেবার জন্য বসে গেল।

এ-নাটক অবন্তী আগেও করতে চায় নি সত্যি কথাই। কিন্তু বসে যাওয়া মানে তো বেশ কিছুদিনের জন্য বসে যাওয়া। কলকাতায় একবার কদর হলে তা শীগ্‌গির বদলানো হয় না, আর বিজয়া তো মফস্বলের দর্শকদের পছন্দ হবারই কথা। তবে কি ধরে নিতে হবে কোনো কারণে অবন্তীর বেশ কিছুদিনের জন্য বসে যাওয়া দরকার হয়েছে?···অবন্তীর শরীর খারাপ বলল, কি শরীর খারাপ বলল না। ভাবলাম, তাহলে ওর বোধহয় আবার ছেলেপুলে হবে, আর অনেক দিনের জন্য বসে যাওয়া এ কারণেই সম্ভব। আর ব্যবসা চালিয়ে যেতে হলে নতুন আর্টিস্ট অবশ্যই দরকার।

কিন্তু বিজয়ার রোলে যাকে দেখলাম, এ যদি নতুন আর্টিস্ট হয় তাহলে তার ভবিষ্যত খুবই উজ্জ্বল বলতে হবে। কাগজে বিজ্ঞাপনের ছবি দেখে মেয়েটির চেহারাপত্র, অবশ্য ভালো লেগেছিল, কিন্তু স্টেজে সামনা-সামনি যাকে দেখলাম তার এই রূপ এই যৌবন কল্পনা করতে পারি নি। সাধারণ দর্শককে মুগ্ধ করার জন্য এ-যে মস্ত পুঁজি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অভিনয় শুরু হতে খুব একটা মনে হলো না মেয়েটির এই প্রথম মঞ্চে আবির্ভাব। বছর কুড়ি একুশ বয়েস। সে-রকম জড়তা তো নেই-ই, একজন মস্ত নামী অভিনেতার বিপরীত ভূমিকায় দাঁড়িয়ে বেশ সপ্রতিভ অভিনয়ই করে যাচ্ছে। তাকে উৎসাহিত করার জন্য দর্শকের মুহুর্মুহু হাততালিও পড়ছে। তার চলা ফেরা ঘোরা এমন কি হাসির মধ্যেও যৌবনের ফুলকি অনস্বীকার্য।

হাফ-টাইমের আলো জ্বলতে কল্লোল—কালু আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।

পাশের চেয়ারের ভদ্রলোক উঠে বাইরে গেছে। সেই চেয়ারে বসে কালু জিগ্যেস করল, কেমন দেখছেন?

কালুর মুখে তেমন খুশির আমেজ দেখলাম না। প্রথম দিনের অভিনয় দেখে এ-নাটক ভালোই উতরে যাবে মনে হলে তার তো খুব খুশি হবার কথা!

বললাম, বেশ ভালোই তো দেখছি, তোমার কেমন লাগছে?

—ভালোই···এ-নাটকে খুব একটা করার তো কিছু নেই, চেহারার জোরেই দর্শক টানতে পারবে—তাছাড়া দাদা গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাতে পারে, ছ'মাসের চেষ্টায় মন্দ দাঁড় করায় নি—তা বলে অবন্তী (নামটা বলেই তাড়াতাড়ি সামলে নিল) ইয়ে, মানে বউদির ট্যালেণ্টের কাছেও নয়—একে দিয়ে লেডি ম্যাকবেথের অভিনয় হবে, না আয়েষার অভিনয় হবে, না অচলার অভিনয় হবে—লাবণ্যরও হবে না।

আমার কেমন মনে হলো অবন্তীর বদলে স্টেজে আর একজন তার দাদার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দর্শকের মন কাড়ছে এটা কালুর খুব একটা পছন্দ হচ্ছে না। একটু থেমে কালু আবার বলল, আমার মনে হয় চেহারা বাদ দিয়ে কেবল অভিনয়ের বিচার করলে বিজয়ার রোলেও বউদি এই মেয়ের থেকে ঢের ভালো পার্ট করত···আপনার কি মনে হয়?

হাসলাম। বললাম, চেহারার মতো চেহারা হলে দর্শক সেটা বাদ দিয়ে বিচার করে না, তাছাড়া অবন্তী নিজেই আমাকে বলেছিল এ-ধরনের রোল তার পছন্দ নয়—

কালু এ-কথাতেও সায় দিলো, পছন্দ হবে কি করে, হীরা দাসীর ওইটুকু রোলে নেমে যে বিষবৃক্ষ নাটক মাত করে দিতে পারে, লেডি ম্যাকবেথ করে দর্শকের রক্ত জমিয়ে দিতে পারে—এই ম্যাড়মেড়ে মান-অভিমান আর প্রেমের রোল তার পছন্দ হতে পারে? এর থেকে দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে বউদিকে রাসবিহারীর ভূমিকায় নামাতে চাইলে বিজয়ার থেকে

সেটা বেশি পছন্দ হতো—ইয়ারকি করে দাদাকে সে-কথা বলেওছিল। আমি হেসে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে অবন্তীর কথা মনে পড়তে জিগ্যেস করলাম, তোমার বউদির কি হয়েছে, প্রথম দিনের নাটকে আসতেও পারল না—শরীর খারাপ শুনলাম ?

—হ্যাঁ, বুকে সর্দি বসে কাহিল অবস্থা, সকালে একশ তিনের কাছাকাছি জ্বর ছিল, ডাক্তার এসে ইন্‌জেকশন্ দিতে ছুপুরের দিকে একটু ভালো দেখে এসেছি। হবে না কেন, ইদানীং রোজ ছ'তিন বার করে চান করে, সন্ধ্যায় ছাদে মাছুর পেতে রাত পর্যন্ত গড়াগড়ি করে—বিজয়ার রিহারসাল জোর তালে শুরু হতেই একেবারে যেন ছুটির জগতে ঢুকে গেছে।

আমার ভিতরে আবার খটকা। কেবল যদি সর্দি-জ্বরই হয়ে থাকে, ভালো হয়ে অবন্তী তাহলে কি করবে ? এই নাটক চলা পর্যন্ত বসেই যাবে ? তিন বার করে চান করা বা ছাদে মাছুর বিছিয়ে শোবার মতো গরমও তো নয় এখন !

কিন্তু আর কিছু জিগ্যেস করার সুযোগ হলো না। পাশের সীটের ভদ্রলোক ফিরে আসতেই কালুকে উঠতে হলো। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আলোও নিভতে শুরু করল।

মিনিট দশ-পনেরো ভালো করে মন দিতে পারছিলাম না। অবন্তীর আবার ছেলেপুলে হবার সম্ভাবনায় অভিনয়ে ছেদ পড়ে থাকলে কালু কি কোনোরকম আভাস দিতো না ?··· অবন্তী (প্রথমে বউদি না বলে ওর মুখ দিয়ে অবন্তীই বেরিয়ে এসেছিল) স্টেজে নেই বলে ওর যেন খুব খেদ আর আফসোস।

তারপর মন দিয়েই দেখেছি। পল্লবের নাট্য-নির্দেশনার মধ্যেও কিছু নতুনত্ব আছে। মিষ্টি নাটক, বেশ ভালোই লেগেছে। বেরিয়ে আসতে আসতে দর্শকদের পরিতৃপ্ত মুখই দেখছিলাম। আবার কালুর ইংগিতও মনে পড়ল। এই পরিতৃপ্তির কতটুকু ভালো অভিনয় দেখার ফলে আর

কতটা নতুন নায়িকার রূপ-যৌবন-শরে বিদ্ধ হয়ে, ঠাওর করা শক্ত। অভিনয়ের দিকটাও ভালোই বলতে হবে, তবে আহা-মরি গোছের কিছু নয়।

বাইরে বেরিয়ে আবার, আবার কালুর সঙ্গে দেখা। আমার অপেক্ষাতেই ছিল কিনা জানি না। কারণ, দেখেই এগিয়ে এসে জিগ্যেস করল, আপনার সঙ্গে তো গাড়ি আছে, বাড়ি যাচ্ছেন না অন্য কোনো দিকে ?

': বাড়ি, তুমি যাবে ?

': আমাকে তাহলে এসপ্ল্যানেডে নামিয়ে দিন, সেখান থেকে ট্রামে চলে যাব।

মনে মনে খুশি হয়েই তুলে নিলাম। একটু এগোতেই ও মন্তব্যের সুরে বলল, নাটকটা লেগে যাবে বলেই মনে হয়—

জবাব না দিয়ে জিগ্যেস করলাম, অবন্তীর শরীর খারাপ বলেই কি এই নতুন নাটক শুরু হলো ?

প্রশ্নের তাৎপর্যের ধার দিয়ে গেল না বলেই বুঝলাম আমি আর যা ভাবছিলাম তা নয়। বলল, শরীর খারাপ আর ক'দিনের ব্যাপার—আজই তো দুপুরের পর থেকে ভালোর দিকে—দাদার মর্জিতেই এটা হয়েছে, অবশ্য বউদিরও সায় না থাকলে হতো না, তাকে বুঝিয়েছে দলকে বড়, দীর্ঘায়ু করতে হলে লোকের চাহিদা অনুযায়ী পপুলার নাটক দরকার আর নতুন মুখও দরকার। সবাইকে দিয়ে সব নাটক হয় না এটা যেমন ঠিক আবার হঠাৎ কেউ ঠেকে পড়লে ভালো স্ট্যাণ্ডবাই আর্টিস্ট মজুত থাকা দরকার এ-ও তেমনি ঠিক। দাদা ভালো একজন পুরুষ আর্টিস্টেরও খোঁজে আছে। প্রতিষ্ঠানের উঠতি মুখে নতুন-নতুন পপুলার নাটকও চাই, যোগ্য স্ট্যাণ্ড-বাইও মজুত থাকা চাই।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, তোমার ধারণা যদি ঠিক হয়. মানে 'বিজয়া' যদি লেগে যায় অবন্তী তো তাহলে অনেক দিনের জন্য বসে গেল ?

': তা তো গেলই, তবে দাদা বলছে কল-শো-এর জন্য বাইরে পুরনো নাটকই বুক করতে চেষ্টা করবে, বউদিকে বসে থাকতে দেওয়া হবে না—কিন্তু মফস্বলে ম্যাকবেথ, শেষের কবিতা বা গৃহদাহর চাহিদা তো তেমন বেশি ছিল না—তখন বঙ্কিমের সেই সব পুরনো সামাজিক বা ঐতিহাসিক নাটকই করতে হবে—কিন্তু বউদির ও-সব রোলও আর ভালো লাগে না স্পষ্টই বলে দিয়েছে। আমার মনটাই কেমন খারাপ হয়ে গেছে, বুঝলেন—

': কেন ?

': অবন্তিকার নতুন নাটক শুরু হলো আর তাতে অবন্তী মানে, ইয়ে বউদিই নেই।

হেসে বললাম, অবন্তী তো কোনোদিন ছিল না, বিদিশা ছিল।

': ওই একই হলো···গ্রুপের সকলেরই একটু মন খারাপ এ-জন্যে, দাদা অবশ্য দুজনকে দু'ভাবে ফিট করে এমন কোনো রোমান্টিক নাটকই খুঁজছিল, সে-রকম পাওয়া গেল না, তাছাড়া বউদিও বলল ব্যবসার সেফটি দেখতে হলে নাম-করা গল্প নেওয়াই ভালো—ঝুলে যাবার চান্স বেশি থাকে না।

আমার কেন যেন মনে হলো 'বিজয়া' ঝোলার চান্স থাকলেই কালুর যেন খুব অপছন্দ হতো না। বললাম, প্রথম দিনের অভিনয়ে যা দেখলাম মেয়েটি ভালোই যোগাড় হয়েছে।

': সেটা দাদার ক্রেডিট, ছ'মাস ধরে ওকে নিয়ে আদা-জল খেয়ে লেগেছিল···তবে চেহারার জোরটা তো নিজস্ব, একটু ভালো করলেই দর্শকের অনেকখানি মনে হয়। মেয়েটার এমনি তো অদৃষ্ট ভালো নয়, নাটকে এসে যদি অদৃষ্ট ফেরে।

আমি জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে আছি। কালু বলল, কথায় আছে না অতি রূপসী না পায় ঘর, এ-ও অনেকটা তেমনি—

': কি-রকম ?

শুনলাম কি-রকম। ওর দাদার সেই অফিস-ক্লাবের এক বন্ধুর ছোট শ্যালিকা এই ঊর্মি রায়। বাপের বাড়ি বর্ধমানে। এ-রকম চেহারা হলে যা হয়, ষোল না পেরুতে স্তাবকের দল জুটেছিল। কিন্তু এ-কালের স্তাবকেরা তো আর পকেটে কবিতার খাতা বয়ে বেড়ায় না, বোমা ছোরা নিয়ে ঘোরে। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের মধ্যেই দু'দুবার রক্তারক্তি কাণ্ড। কলেজে পড়ার পর্বে মেয়ে নিয়ে বাপ-মায়ের আরো বড় সংকট। তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে পার করার জন্য দু'দুবার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক, কিন্তু উড়ো হুমকির চিঠি পেয়ে বরপক্ষের তরফ থেকে বিয়ে বাতিল। মেয়ে একজনের প্রণয়াসক্ত এবং তার সঙ্গেই তার বিয়ে স্থির। নিরুপায় বাপ-মা তখন কলকাতায় বড় জামাইয়ের আশ্রয়ে এসে তৃতীয় একটি ভালো ছেলের সঙ্গে মেয়ের একেবারে বিয়ে দিয়ে ঝাড়া হাত-পায়ে বর্ধমানে ফেরে।···কিন্তু মেয়ের বরাতখানাও তেমনি। এমন রূপসী বউ পেয়ে ছেলের মাথাই বিগড়ে গেল। সন্দেহ রোগে ধরল তাকে। তার ট্যুরের চাকরি, ট্যুরে যেতে পারে না, মন দিয়ে শেষে অফিস পর্যন্ত করতে পারে না। দু'বছর না যেতে উন্মাদ দশা তার। শেষে আত্মহত্যা করে শান্তি। ···রূপের এই অভিশাপের ফলে মেয়েও এই রূপের জোরেই নিজের পায়ে দাঁড়াবে সংকল্প করল। ফিল্ম স্টুডিওতে যাতায়াত করে নিজেই প্রোডিউসার আর ডাইরেক্টরদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু করে দিলো। বিপাকে পড়ে বড় ভগ্নিপতি অর্থাৎ অফিস-ক্লাবের সেই বন্ধু এই শ্যালিকাকে নিয়ে একদিন পল্লবের কাছে হাজির।—ভাই বাঁচাও, নইলে এরপর আমার আত্মহত্যার দিন ঘনিয়ে আসবে, সাহস আর তেজের চোটে কোথায় কার খপ্পরে গিয়ে পড়বে কে জানে—তুমি তোমার ইউনিটে নিয়ে নাও, আমার খুব বিশ্বাস তোমার হাতে থাকলে কালে দিনে ও ঠিক নাম করবে আর নিজের দায়িত্ব নিজেই নিতে পারবে।···কালুর

দাদা মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেশ ইমপ্রেসড, কিন্তু মেয়ে আর্টিস্ট নেবার দায়িত্ব অবন্তীর। এ-মেয়ে তৈরি হলে কালে দিনে অবন্তিকার পসার বাড়বে এই দূরদৃষ্টি তারও আছে। কিন্তু তৈরি.হবার পর বেশির ভাগেরই উচ্চাশা এত বেড়ে যায় যে বেশির ভাগই তারা স্টেজের সর্বত্রময়ী নায়িকা হবার টোপ গিলে অন্য প্রতিষ্ঠানে সরে পড়ে। রূপে গুণে সে-যোগ্যতা থাকলে তবেই এ-রকম হয়। পল্লবের মন আগেই বুঝেছে, তাই শর্তসাপেক্ষে তাকে নিতে রাজি হলো। পাঁচ বছরের কনট্রাক্ট সই করতে হবে, এর মধ্যে আর কোনো স্টেজে বা সিনেমায় সে যেতে পারবে না। উর্মিমালা রায় সানন্দে রাজি।

এরপর এক বছরের মধ্যে ওদের কারো সঙ্গেই আর আমার যোগাযোগ নেই। কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে বুঝতে পারি বিজয়া শহর শহরতলি আর মফস্বলে খুবই ভালো চলছে। সমালোচনা পড়ে মনে হয় উর্মিমালার অভিনয়ের ধারও বাড়ছে। তার রূপ-যৌবনে সমালোচক কতটা অভিভূত বলতে পারি না।

পাশাপাশি পাড়াগাঁয়ে আর দূরের বড় বড় ফ্যাক্টরী এলাকায় আর একখানা নতুন নাটকের বিজ্ঞাপনও চোখে পড়েছে অবন্তিকা গোষ্ঠীর। আলিবাবা। নায়িকা মর্জিনার ভূমিকায় নাচের ভঙ্গীতে লাস্যময়ী উর্মি-মালার ছবি। ও নাচও জানে। জানা ছিল না। আলিবাবার ভূমিকায় স্বয়ং পল্লব দত্ত। কিন্তু এই রোলে তার করণীয় খুব কিছু নেই। করণীয় কিছু যার আছে সেই আব্দাল্লার ভূমিকায় একটা নতুন নাম চোখে পড়েছে। কলকাতায় কখনো হচ্ছে না, তাই বোঝা গেল পাড়াগাঁয়ে আর কার-খানা এলাকায় কেবল টাকার দিকে চোখ রেখেই এই নাটক মঞ্চস্থ করা হচ্ছে।

বছর খানেক বাদে এক ছুটির দিনের সকালে পল্লব দত্ত হঠাৎ আমার বাড়িতে হাজির। সহজ অভ্যর্থনা জানিয়ে বললাম, অনেক দিন তোমাদের

খবর নেই, অবন্তীকে নিয়ে এলে না কেন, ভালো আছে তো ?

‘: হ্যাঁ, ভালোই আছে…তবে ওকে নিয়ে একটু সমস্যায় পড়েই আপনার কাছে এলাম।

কৌতূহল চেপে চায়ের হুকুম দিয়ে এসে বসলাম।—তোমাদের বিজয়া তো খুব ভালোই চলছে দেখছি।

পল্লব বলল, ভালো চলছে, তবে এত দিনের নাম করা পুরনো বই তো …এবারে মাঝে মাঝে পুরনো নাটকের দিকে ফেরা দরকার, আর তার মধ্যে নতুন নাটকের জন্য রেডি হওয়া তো খুবই দরকার।

‘: মফস্বলে-টফস্বলে আলিবাবা করছ দেখলাম…সেটা কেমন হচ্ছে ?

‘: টাকার দিক থেকে খুবই ভালো, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে আর একেবারে ফ্যাক্টরী এরিয়া ছাড়া ও নাটক আর কোথাও করছি না।

‘: তোমাদের নতুন নায়িকাটি বিজয়ার রোলে তো এখনই খুবই ভালো করছে দেখছি, ও-দিকে মর্জিনা করছে—ভালো নাচেও বুঝি ?

হাসল।—নাচের কিছুই জানত না, এর আগে জীবনে কখনো নাচেওনি —বাড়িতে এনে রেকর্ড প্লেয়ার বাজিয়ে-বাজিয়ে অবন্তী ওকে হাতে ধরে শিখিয়ে ওই রোলে তৈরি করেছে—গানও জানে না, প্লে-ব্যাকের সঙ্গে লিপ-মুভমেণ্টে কাজ চালাতে হয়, এ নাটক এখন কলকাতায় বা শহুরে মফস্বলে অচল।

চা আসতে যে-যার পেয়ালা তুলে নিয়ে জিগ্যেস করলাম, তা অবন্তীকে নিয়ে হঠাৎ কি সমস্যা হলো…নতুন যে নাটক করতে চাও ওর পছন্দ হচ্ছে না ?

‘: তা নয়…কোনো নাটকই করতে চাইছে না, না নতুন না পুরনো। বলে, ব্যবসা তো ভালোই হচ্ছে, উর্মিকে নিয়েই চালিয়ে যাও, মেয়ে বড় হচ্ছে, এখন তার দায় সামলাই। এটা কোনো কথা হলো বলুন তো ?

আমার বিবেচনায়ও এটা কোনো যুক্তির কথা নয়। মেয়ের এখন কত বা

বয়স, আট সাড়ে আট। এই বয়সে অবন্তী নিজে তো কাবুলিওয়ালায় ছোট মিনির পার্ট করেছিল, এখন থেকে মেয়ের ভাবনায় পড়বে কেন!

একটু ইতস্তত করে জিগ্যেস করলাম, উর্মিমালাকে নিয়ে কিছু মুশকিল হচ্ছে না তো···নতুন নাটক করলে তাকেও তো বাদ দিতে পারছ না?

সোজা জবাব দিলো, অবন্তী চাইলে একটা নাটকে বাদ দিতে অসুবিধে কি? আপনি তো অভিনয় বোঝেন—অভিনয়ের দিক থেকে তো সে অনেক বড়, উর্মির সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না, ওকে গড়ে পিটে আর্টিস্ট বানাতে হয়েছে আর অবন্তী বর্ন-আর্টিস্ট। এ-সব তুচ্ছ ব্যাপারের অনেক উপরে সে, উর্মিকে বাদ দিতে চাইলে বক্স অফিসের দিকে চেয়ে অবন্তী উল্টে আমাকে মারতে আসবে। ও এত উদার যে বিজয়ার সাকসেসের পর নিজেই তাকে বলে দিয়েছে, পরের নাটকে সে নিজের রোল বেছে নেবার পর অন্য রোল ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে—তাই শুনে আমিই বরং আড়ালে অবন্তীকে বকতে গেছলাম। অবন্তী বলেছে, আমাকে বাদে ও একটা বছর চালিয়ে গেছে শুধু নয়, তোমাদের ঢের বেশি লাভের মুখ দেখিয়েছে—সি ডিজারভস দিস্।

': তাহলে তোমার কি মনে হয়···ও অভিনয় করবে না বলে কেন?

': আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, দেয়ার মাস্ট বি সাম্ সেন্টিমেণ্ট অফ সাম সর্ট্।

এরপর পল্লব আমারই একটা উপন্যাসের নাম করে বলল, আপনার ওই বইটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল, দুটো মেয়েরই জোরালো রোল, একটা মেয়ে সুন্দরী আর একজন সাদা-মাটা এদিকটাও মেলে। কিন্তু অবন্তী উড়িয়েই দিলে, বলল, হলোই বা কাকুর বই—কোনো মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নায়ককে পেতে হবে এমন অভিনয়ে আমার কাজ নেই।

আমার মনে আছে অবন্তী বইটা বেরুবার পর বলেছিল, দু'বার পড়ে ফেললাম কাকু, দারুণ—

পল্লব সখেদে আবার জানালো, ওটা করবে না বলায় বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ করার প্রস্তাব দিয়েছিল, একসময় ওটাও নাকি ওর করার ইচ্ছে ছিল, তখন বলেছিল নায়িকা নয়, নির্মলা অর্থাৎ আওরংজেবের প্রীতির সম্ভাষণ 'ইমলি বেগমের' রোলটা করবে। কিন্তু এখন তা-ও আর করবে না বলছে, কেবল এক-কথা, উর্মি যখন ভালোই চালিয়ে যাচ্ছে তাকে নিয়েই নতুন কিছু ভাবো···

ব্যাপারটা আমার কাছেও রহস্যজনক লাগছে, জিগ্যেস করলাম আমি কি করতে পারি বলো—

': আপনার কথা শুনতে পারে, আপনি যদি একটু বুঝিয়ে বলেন···আর হঠাৎ কি হলো তাও যদি একটু বুঝতে চেষ্টা করেন।

': তাহলে যদি সম্ভব হয় ওকে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে বোলো।

একটু ইতস্তত করে বলল, আমি আপনার কাছে এসে অনুরোধ করেছি সেটা ওর জানা ঠিক হবে না···আপনি যদি একটা ফোন করে ওকে ডাকেন—

': তোমাদের বেহালার বাড়িতে ফোন এসেছে জানতাম না, কত নম্বর?

': বেহালার বাড়ি তো আমরা সাত আট মাস আগে ছেড়ে দিয়েছি, আপনি জানেন না? এখন আমরা গলফ্ ক্লাবে একটা বাড়ি নিয়ে আছি, এক-তলায় অফিস ঘর, দোতলায় থাকি।

আমি রাজি হতে পল্লব বাড়ির ঠিকানা আর ফোন নম্বর রেখে চলে গেল। সন্ধ্যায় ফোন করলাম। অবন্তীই ফোন ধরেছে। গলা শুনেই ধরতে পারল আর খুশিও খুব।—আশ্চর্য, আমাকে মাঝে মধ্যে মনে পড়ে তাহলে?

প্রথমে মেয়ের খবর, পরে অবন্তিকার খবর নিলাম। বিজয়ার পর তারা কি অভিনয় করছে আর অবন্তী কোন্ রোলে নামছে তা-ও জিগ্যেস করলাম। জবাব সুন্দর হাসি আর একটু তরল সুরের কথা, এখনো কিছু

ঠিক হয় নি, ঠিক হলে কাগজে দেখতে পাবে।

বললাম, সময় করে একদিন আয় না, অনেক দিন তোকে দেখি নি।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জিগ্যেস করল, কবে?

': যে দিন তোর খুশি, মেয়েকেও নিয়ে আসিস।

সেটা হয়ে উঠবে না, শনি রোববারেই অবন্তিকার অফিসের কাজের চাপ বেশি, পার্টি আসে, আর্টিস্ট টেকনিশিয়ানরা আসে। এর মধ্যে সকাল সাড়ে ন'টায় আলোকে স্কুলে পাঠিয়ে যেতে পারি।

': মেয়ের আলো নাম রেখেছিস বুঝি? খাসা নাম, ঘর আলো করা মেয়ে হয়েছে তো?

হাসল।—তা হয়েছে, তবে আমার ঘর মেয়ে আর কতদিন আলো করে থাকবে বলো ··।

': ঠিক আছে, তুই-ই আসিস, দুপুরে একেবারে খেয়ে যাবি কিন্তু।

দিন তিনেক বাদে এসেছে। বছর উনত্রিশ হবে ওর বয়স, কিন্তু দেখলে মনে হয় বয়সটা সেই চব্বিশ পঁচিশেই থেমে আছে। সুঠাম স্বাস্থ্য, কালোর ওপর তেমনি মিষ্টি মুখ। খানিক গল্প করে আমার স্ত্রী উঠে যেতেই সকৌতুকে আমার দিকে ফিরল।—হঠাৎ তোমার এই আসার হুকুম কেন কাকু, বীরপুরুষ চুপিচুপি এসে শেষে তোমার শরণাপন্ন হলো?

আমার হাঁ-মুখ।—বীরপুরুষটা কে?

চেয়ে আছি। ওর চোখের হাসি ঠোঁটের হাসির থেকেও সুন্দর। হঠাৎ জিগ্যেস করল, এর মধ্যে কালুর সঙ্গে দেখা-টেখা হয়েছে নাকি?

': না তো···কেন?

': আমাদের টেলিফোন নম্বর পেলে কোথায়?

বিপাকে পড়ছি কিনা বুঝছি না। বোকার মতো ফিরে বললাম, অবন্তি-কার বা পল্লবের ফোন নম্বর পাওয়া এমন কি কঠিন ব্যাপার?

অবন্তী ছোট মেয়ের মতোই হেসে সারা। তারপর বলল, কাকু, তুমি

অভিনয়ও জানো না, মিথ্যেটাকেও ভালো করে সামাল দিতে পারো না —কিন্তু তুয়েতেই সিদ্ধহস্ত যে তার কেমন ছেলেমানুষি ভুল! এক মাসও হয় নি আমাদের ফোন এসেছে, গাইডে নাম-নম্বর কিছুই এখনো নেই, গ্রুপের বাইরে কেবল কালু ফোন নম্বর জানে—আর আমাদের নতুন লেটার-হেড-এ যাদের কাছে চিঠি যাচ্ছে তারাই কেবল জানছে···ফোনে তোমার কাছে আসার ডাক পেয়েই বুঝেছি আমাদের এমন বুদ্ধিমান নাট্যাচার্যও একটা কাঁচা কাজ করে ফেলেছে।

মনে মনে ওর বুদ্ধির তারিফ করতেই হলো। বললাম, সবই বুঝলাম, কিন্তু তোর ব্যাপারখানা কি? যাকে নিয়ে এত উৎসাহ করে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে ফেললি তাকে এমন দুশ্চিন্তায় ফেলছিস কেন?

আবার হাসি।—দুশ্চিন্তায় ফেলতে যাব কেন, উৎসাহ দেবার জন্য সুতো ছেড়ে দিয়ে তো তার দৌড়ের জোর দেখছি!

এরপর আমি ইচ্ছে করেই চুপ একেবারে। ও মাঝে মাঝে আমাকে দেখছে আর অল্প অল্প হাসছে। তারপর একসময় বলল আচ্ছা কাকু, তুমি তো লেখক, ধরো কোনো মেয়ে যদি কল্পনার বাসা বাঁধে, অভিনয়ের জগতেও তারা স্বপ্নের মতো কোনো আদর্শ রেখে যাবে, মেয়েটা পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বছর বয়েস পর্যন্ত মানে যতদিন সম্ভব অভিনয়ের নতুন নতুন দরজা খুলে দেবে, আর তার শিল্পীও কেবল তাই করে যাবে— এমন একটা মেয়ের সেই স্বপ্ন যদি ভেঙে যায়—তার কি গতি?

যা বলল একটু ভেবে নিয়ে ওর দিকে তাকালাম।—তোর শিল্পী তোর সেই স্বপ্নের কথা জানতো?

': না জানলে সে কোনো শিল্পীই নয়।

তাহলে গোড়াতেই বাধা দিলি না কেন···আর কাউকে নাক গলাতে দিলি কেন?

': সে-ও তো মুশকিল কাকু, প্রতিষ্ঠানটা তো আর স্বপ্ন নয়, অনেক

মুখের খাবার জোটাতে হয়, চাহিদা মেটাতে হয়, পিছনে নতুন আর্টিস্টের জোর না থাকলে মাত্র দুজনের একজনও ঠেকে গেলে একেবারে তালা পড়ে যাবে···তাছাড়া দুজনের স্বপ্নে দর্শক কতকাল বিভোর থাকবে, বৈচিত্র্যের পুঁজির জন্যেও নতুন আর্টিস্ট নতুন মুখ দরকার সত্যি কথাই —মেয়ে আর্টিস্টের সঙ্গে জনা দুই বাছাই করা ছেলে আর্টিস্টও নেওয়া হয়েছে।

': তাহলে তোর স্বপ্নের জগৎ মার খাচ্ছে কি করে? যখন তোরা করবি তখন এক রকম হবে, যখন অন্যেরা করবে তখন আর একরকম হবে।

অবন্তী প্রত্যয়ের সুরে আস্তে বলল, মার খাচ্ছে কাকু, স্বপ্ন থেকে সরে আসার লক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি, যত দেখতে পাচ্ছি তোমাদের জামাই ততো হাঁসফাঁস করছে, ততো কুঁকড়ে যাচ্ছে, গোপনতার আশ্রয় নিতে চাইছে।···এই ব্যাপারটাই ধরো না, অভিনয়ে আসতে চাইছি না বলে সে আমার সঙ্গে ঝগড়া রাগারাগি করতে পারত, বলতে পারত যাচ্ছি আমি কাকুর কাছে তুমি কেমন না অভিনয় করো আমি দেখছি—সেটা কত বেশি সহজ হতো। এই জোরের রাস্তা না ধরে তাকে তোয়াজের রাস্তা ধরে আমার কাছে আসতে হয়েছে, তাতে সুবিধা না পেয়ে চুপিচুপি তোমাকে এসে ধরেছে, হয়তো এ-ও বলেছে সে-যে এসেছিল, আমি যেন জানতে না পারি···বলেছে কি বলে নি?

মাঝখান থেকে আমিই বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেলাম। বললাম, এ-সব ছোটখাটো ব্যাপারের জন্য অভিমান করে তুই তা বলে অভিনয় করাই ছেড়ে দিবি?

': অভিমান দুর্বল করে কাকু, আমি সোজা রাস্তায় হাঁটা-চলা করি। ·· তা'ছাড়া ছোটখাটো ব্যাপার এটা নয় কাকু, নিজের বাবার থেকেও তুমি আপনার জন, তোমাকে বলতে সংকোচ নেই, চার-পাঁচ মাসের ট্রেনিংয়ের পর এই এক বছর হলো ঊর্মি স্টেজে অভিনয় করছে, আর

সত্যি কথা বলতে কি, তোমাদের জামাইয়ের গুণে দিনে-দিনে ভালোই করছে···ওকে কেড়ে নেবার জন্য এখন নানাজনে লোভের টোপ ফেলছে, কাগজে কলমে পাঁচ বছরের কনট্রাক্টে তাকে আটকে রাখা হয়েছে বটে, কিন্তু অভিনয় করব না বললে কে জোর করে অভিনয় করাতে পারে? সে-যাক, ওর আসার এই দেড় বছরের মধ্যেই তোমাদের জামাইয়ের মদ খাওয়া দেড় গুণ বেড়েছে, কিন্তু আমার কাছে সেটা গোপন করার চেষ্টা—মেয়েটা বাবা-বাবা করে আর বাপেরও মেয়ের ওপর টান কম কিছু নয় সত্যি কথাই—প্রোগ্রাম না থাকলে তাকে কথা দিয়ে গিয়েও সময়ে ফিরতে পারে না, আমাকে নানা ঝামেলার কথা শোনায় আর পরদিন মেয়ের কাছেও ভাঁওতা দেয়—স্বপ্নের জগৎ কেন মার খাচ্ছে এখন বুঝতে পারছ?

এই শুনে আমি ভিতরে ভিতরে সত্যি উদ্বিগ্ন!—তাহলে ওই মেয়েকে তুই গোড়াতেই ছেঁটে দিচ্ছিস না কেন—অন্যত্র টোপ গেলে তো গিলুক!

': ছেঁটে দেবো! তুমি বলো কি কাকু, এ-জন্যে উর্মিকে আমি ছেঁটে দেবো? আমি বরং ওকে আরও যত্ন করে ধরে রাখব। যে সমুদ্র আমি তোমার জামাইয়ের মধ্যে দেখেছি, জঞ্জালের মতো একটা মেয়ে এসে সেটাকে একেবারে মিথ্যে করে দেবে এ কখনো হয়? উত্তেজনার মুখে হেসে ফেলল, তুমি আমার জন্য একটুও ভেব না কাকু, রাহু চন্দ্র-সূর্য গেলে কিন্তু সামলাতে পারে না, ধরেও রাখতে পারে না—হাজার ঘন মেঘে চাপা পড়লেও তাদের রূপ খোওয়া যায় না—আমার সে-জন্য কোনো দুশ্চিন্তা নেই—ও না ছেঁটে দিলে উর্মিকে সরানোর চিন্তা আমার মনেও আসে না।

···এর দু'বছর বাদে অবন্তীর হঠাৎ সেই উল্টো মেঘদূত লেখার বায়না ধরে সেই চমৎকার চিঠি। আবার অভিনয়ে নামবে আর নিজের চরিত্রানুগ

কোনো গল্প চায় এটুকুই ভেবেছিলাম। তার দু'দিন বাদেই সপরিবারে আমার বাইরে যাবার কথা। ফিরতে মাস দেড় দুই। সে-কারণেই ব্যস্ত ছিলাম। ফোন করব-করব করেও আর ফোন করা হয় নি। বাইরে গিয়ে মনে পড়েছিল, চিঠিও লিখতে পারতাম। কিন্তু অবন্তীর চিঠি সঙ্গে আনা হয় নি, ঠিকানা মনে নেই।

প্রথম বড় ধাক্কা খেয়েছি ফিরে এসে ফোনে খবর নিতে গিয়ে। ওদিক থেকে কোনো মেয়েরই গলা। কিন্তু অবন্তীর খোঁজ করতেই রূঢ় জবাব এলো, অবন্তী নামে কেউ এ-বাড়িতে থাকে না!

ভাবলাম ভুল নম্বরে ফোন করেছি। যাচাই করতে জবাব এলো, হ্যাঁ, এই নম্বরই।

দ্বিধায় পড়ে আবার জিগ্যেস করলাম, অভিনেতা শিল্পী পল্লব দত্তর বাড়ি কি এটা?

এবারের জবাব আরো রূঢ়।—হ্যাঁ, তাঁরই বাড়ি, তিনি বাড়ি নেই, আর অবন্তী নামে কেউও নেই!

সশব্দে রিসিভার নামানোর শব্দ।

আমি বিমূঢ় খানিক। তাড়াতাড়ি অবন্তীর সেই চিঠিটা বার করলাম। তারপর আরো অবাক, চিঠিটা প্যাডের সাদা কাগজে লেখা, আর উপরে শুধু চিঠির তারিখ, বাড়ির ঠিকানা ফোন নম্বর কিছুই নেই—আগে খেয়ালই করি নি।

এরপর গাইড খুলে অবন্তিকার অফিসের ফোন নম্বর পেলাম। সেখানকার একজন খবর দিলো, অবন্তী দেবী ছ'মাস হলো তাঁদের বেহালার বাড়িতে থাকেন···না, বছরখানেকের বেশি হয়ে গেল তিনি অফিসেও আসেন না।

বুঝলাম অবন্তীর স্বপ্ন খুব ভালো রকমই ভেঙেছে। আরো বুঝলাম উল্টো মেঘদূতের নাটক চেয়ে সে বেহালা থেকেই চিঠি লিখেছিল।

আরো মাস দুই বাদে অবন্তী হঠাৎ এক সকালে নিজেই এসে হাজির। অনেকটা আগের মতোই, কিন্তু ভিতরে শুকনো টান ধরেছে বোঝা যায়। এসেই অনুযোগের সুরে বলল, কত কায়দা করে একটা চিঠি লিখলাম, জবাবও দিলে না, একবার খোঁজও করলে না।

আমি ভ্রূকুটি করে চেয়ে রইলাম একটু।—বোস্, জবাব দিই বা খোঁজ নিই এটা তুই চেয়েছিলি? ঠিকানা নম্বর ছেড়ে শুধু তোর নাম লিখে পোস্ট করলেই চিঠি তোর কাছে চলে যেত?

হাসতে লাগল।—কেমন আছ, বাইরে গেছলে শুনলাম?

': কোথায় শুনলি?

': একটা কথা সত্যি কিনা জানার জন্য কালুকে তোমার কাছে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলাম। সে ফিরে গিয়ে বলল, বাইরে গেছ, ফিরতে অনেক দেরি। কথাটা সত্যি জেনে তোমার সুপারিশের আশায় এলাম।

আমি একটু কঠিন গলায়ই বললাম, তোকে ওই বাড়ি আর অবন্তিকা দুই-ই ছাড়তে হলো তাহলে?

ছোট নিঃশ্বাস ফেলল একটা।—হলো তো···মেয়েটার মুখ চেয়েই সরে এলাম, তুমি জানলে কি করে, ফোন করেছিলে নাকি?

': বাড়িতে অফিসে দু'জায়গাতেই ফোন করেছিলাম, বাড়ির ফোন একটি মেয়ে ধরেছিল, সাফ বলে দিলো অবন্তী নামে কেউ এ-বাড়িতে থাকে না··মেয়েটি কে?

স্বাভাবিক সুরেই জবাব দিলো, বুঝতেই তো পারছ কে···।

চেয়ে আছি। হঠাৎ কিছু যেন একটু ব্যতিক্রম চোখে পড়ছে। ঠাওর করতে পারছি নাকি। একটু বাদেই ঠাওর হলো। আগে কপালে ছোট করে সিঁদুর টিপ পরত, সিঁথির সিঁদুরের আঁচড়ও সূক্ষ্ম ছিল। এখনকার সিঁদুর-টিপ আকারে সে-তুলনায় অনেকটাই বড়, সিঁথির সিঁদুরও জ্বল-জ্বলে মোটা দাগের। একটু গুম হয়ে থেকে বললাম, থিয়েটার ছাড়লি,

বাড়িও ছাড়লি, এখন তাহলে কি ধরে আছিস ?

সহজ সাদাসিধে জবাব, কেন ধরে থাকার মতো আমার মেয়ে কম কিছু নাকি। হাসল একটু, আর এবারে সত্যি তোমাকে একবারটি ধরতে এলাম।

আমি এখনো গম্ভীর।—তোর এ হাসি আমার ভালো লাগছে না, যাক কি চাস বল্।

কি চায় শুনে আমি আরো আহত। বেহালায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের একটা নতুন স্কুল হয়েছে—নার্সারি থেকে শুরু করে চার ক্লাস পর্যন্ত পড়ানো হয়। আমারই খুব ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয়ার স্কুল একটা, আর সেই সুবাদে আমিও ওই স্কুলের গভর্নিং কমিটির একজন। দুজন টিচার যখন নেওয়া হয়েছিল তখন আমি কলকাতার বাইরে। এখন আরো তিনজন টিচার নেওয়া হবে শুনেছে। এখন আমার চেষ্টায় যদি কাজ পায়।

আমি স্তম্ভিত। নার্সারি আর প্রাইমারি স্কুলের মাইনে কি জানি। বললাম, তোর টাকায় কোম্পানি, তোকে টাকা পর্যন্ত দেয় না এখন! আর তুই তা সহ্য করছিস ?

অবন্তী নির্লিপ্ত মুখে জানান দিলো, অবন্তিকা এখন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, সেখানে সে আর কেউ নয়।···একবার যা ছেড়ে এসেছে তার প্রতি আর কোনো টান নেই।

রাগত সুরে বললাম, তুই না হয় বোকার মতো উদার হয়ে সব ছেড়ে দিলি, তোর মেয়ের খরচ আছে না ? তার ভবিষ্যত আছে না ?

ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলো, আর ওই টাকার জোরে মেয়ের ভবিষ্যতে আমার কাজ নেই কাকু—গয়নাগুলোতে হাত পড়ে নি, আমার নিজের রোজগারের টাকাও কিছু আছে—মেয়েকে বড় স্কুল থেকে কম মাইনের ছোট স্কুলে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম, ওর কাকা ক্ষেপে আগুন—তার ওপর নির্ভর করা বরং অনেক সম্মানের···মেয়ের ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত, তবু

আমি কিছু করলে কালুর বোঝা একটু কমে আর কাজের মধ্যে না থাকলে নিজেরও ভালো লাগে—

বললাম, ভালো অনার্স পেয়ে বি. এ. পাশ করেছিলি, কোনো হাই-স্কুলে চেষ্টা করছিস না কেন, এই স্কুলে কি বা মাইনে···।

এবারের হাসিটুকু বিষণ্ণ, বলল, যে স্কুল থেকে আমি পাশ করে বেরিয়েছিলাম সেই স্কুলের প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তখন খুব ভালোবাসতেন আমাকে। এখন দুঃখ করে ফিরিয়ে দিলেন, কারণ তিন সাড়ে তিন বছর আগেও স্টেজে অভিনয় করেছি, টিচাররা তো দেখেছেই, এখনকার উঁচু ক্লাসের ছাত্রীরাও অনেকে দেখেছে—একজন স্টেজ অ্যাকট্রেসকে তিনি স্কুলের টিচার হিসেবে নেন কি করে। যাক কাকু, মাইনেটা বড় কথা নয়, কিছু একটা নিয়ে থাকা দরকার আমার···এখানেও কি সে-রকম অসুবিধা হবে?

বললাম, টিচার যদি নেয় কোনো অসুবিধেই হবে না, তুই এপ্ল্যাই করে তার একটা কপি কালুকে দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দে। তুই চাকরি করবি তাতে ওর আপত্তি নেই তো?

হেসে বলল, ও একটা মাথা পাগলা ছেলে, ওকে বোঝাতে হয়েছে টাকার জন্য নয়, সময় কাটানোর জন্যেই কিছু করা দরকার আমার। দেওরের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত মুখ।—ও কি কাণ্ড করেছিল জানো?

লক্ষ্য করেছি পল্লব সম্পর্কে নির্বিকার। বড় রকমের কোনো অভিযোগই নেই যেন। কালু কি কাণ্ড করেছে হেসে-হেসেই বলল বটে, কিন্তু নিছক হাসির প্রহসন নয় সেটা। তবে শুনে ছেলেটার সম্পর্কে আমারও ধারণা আরো উঁচুই হলো।···অবন্তী তখন মেয়ে নিয়ে বেহালার বাড়িতে চলে আসবে ঠিক করেছে, আর কেবল দেওরকেই সেটা জানিয়েছে। কালু হঠাৎ এক রাতে দাদার কাছে এসে হাজির। সোজা প্রস্তাব, সে কোনো সংস্কারের ধার ধারে না—ঊর্মিমালাকে বিয়ে করতে চায়, দাদাকে যে-

ভাবে হোক ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

শুনে দাদা তো বটেই, অবন্তীসুদ্ধু হাঁ। পরে পল্লব খেঁকিয়ে উঠেছে, ইয়ারকি হচ্ছে ?

': ইয়ারকি যদি ভাবো, খুব ভুল হবে, আজ আমি মরিয়া হয়েই তোমাকে মনের কথা বলতে এসেছি !

দাদা গর্জন করে উঠেছে, আমি বললেও তোর মতো ছেলেকে সে বিয়ে করতে রাজি হবে কেন ?

': তোমার জোর সুপারিশ থাকলে হবে, তুমি আর বউদি তাকে অবন্তিকার চার আনার শেয়ার লিখে দিতে রাজি হলে আপত্তি করবে বলে মনে হয় না—বউদি, তুমি তোমার কিছু অংশ উর্মিমালাকে ছাড়তে রাজি আছ ?

অবন্তী নির্বাক। পল্লব গর্জন করে উঠেছে, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল—অ্যাঁ ?

': হয় নি এখনো, হতে যাচ্ছে—উর্মিমালাকে তুমি জানিয়ে দিতে পারো রাজি না হলে তার প্রাণে বাঁচা দায় হবে—ফাইনাল কথা শোনার জন্য হাতে গুনে আমি সাত দিন অপেক্ষা করব।

অবন্তী সত্যি হেসে সারা। বলল, সত্যি কাকু, তুমি বিশ্বাস করবে না, টানা আড়াই মাস এরপর কলকাতায় অবন্তিকার কোনো শো নেই—সব মফস্বল আর বাইরের প্রোগ্রাম ! ফিরে এসেই ওর দাদা আমাকে জিগ্যেস করে, কালুর মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে ?

একটু বাদে মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে লাগল। বলল, ছেলেটার জন্য আমার কি যে খারাপ লাগে কাকু, মাইনে-পত্র এখন দস্তুরমতো ভালো, তেত্রিশ বছর বয়স হতে চললো ওরও···আমার এই অবস্থার জন্য ছেলেটা বিয়েই করল না। আমি প্রায়ই এ-নিয়ে রাগারাগি করেছি, এ-ও বলেছি তুমি বিয়ে না করলে, এ-বাড়িতেও আমি থাকব না, আলোকে নিয়ে চলে

যাব। এমন পাজি বলে কি জানো? গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলল, রাজি আছি, দাদাকে তুমি ডিভোর্স করো—আমরা দুজন দুজনকে বিয়ে করে ফেলি—তাহলে তোমার আর এ-বাড়ি ছাড়ার চিন্তা মাথায় আসবে না।

আমিও হেসে ফেলেছিলাম।—তারপর?

—তারপর আর কি, বুড়ো বয়সে আমার হাতে গাঁট্টা খেয়েছে। আর আমিও বুঝেছি কোনো হম্বি-তম্বিতে ওকে রাজি করানো যাবে না।

এর পাঁচ ছ'দিন বাদে অবন্তীর দরখাস্তের কপি নিয়ে কালু আমার বাড়িতে এসেছে। এ-যুগের এক রত্ন ছেলে মনে হয়েছে ওকে আমার। ...অবন্তী পল্লবের প্রসঙ্গ প্রায় এড়িয়েই গেছল। কালুর মুখে বিস্তারিত শুনলাম। ...উর্মিমালা যে-করেই হোক ওর দাদাকে হাতের মুঠোয় এনেছে, অবন্তিকার কর্তৃত্বও নিজের হাতে নিয়েছে। গুড্উইল নষ্ট হবে, উকীলের এই পরামর্শ না পেলে আর কত ক্ষতি হবে না বুঝলে প্রতিষ্ঠানের নামই বদলে যেত।...না, এত মদ খেতে কালু দাদাকে আগে কখনো দেখে নি। অবন্তী মেয়ে নিয়ে বেহালার বাড়িতে চলে আসায় প্রথম একটা বছর প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, মদ খেয়ে বেহালার বাড়িতে এসে হল্লা করেছে। স্ত্রী না আসুক, তার মেয়ে চাই! মত্ত অবস্থায় এলে বউদি মেয়েকে কাছে আসতে দিত না, বাড়িতেও ঢুকতে দিত না। দাদার হল্লা আরো বেড়ে যেত, চিৎকার করে বলত, এ-বাড়িতে তার সমান অধিকার, তাকে ঢুকতে না দেবার সে কে?

...অবন্তীর নাকি সে-কি ঠাণ্ডা পাথর মূর্তি। একটুও গলা না তুলে বলে, ঢুকে ছাখো, তখন বুঝবে ঢুকতে না দেবার আমি কে।

আশ্চর্য, মদে চুর দাদা এ-কথার পরে একদিনও বাড়িতে ঢুকতে সাহস করে না। নেশার ঘোরে একদিন এসে পল্লব নাকি কেঁদেও ফেলেছিল,

কত দিন দেখি না, মেয়েটাকে একবার আমাকে দেখতেও দেবে না।

অবন্তীর জবাব, মদ না গিলে সভ্য-ভব্য বাপের যোগ্যতা নিয়ে এসো, দেখতে দেবো।

তাই আসবে বলে গেছে। কিন্তু আকণ্ঠ মদ না খেয়ে কখনো আসতে পারে নি। কালুর কেমন ধারণা, মদ খেয়ে স্নায়ু না তাতিয়ে তার দাদা বউদির সামনে এসে দাঁড়াতেও পারে না। মদ খেয়ে কাণ্ডজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে তবে আসে।

…মাস পাঁচ ছয় আগে একটা বড় কাণ্ড হয়ে গেছে। এক সকালে রেজিস্ট্রি ডাকে একটা চিঠি এলো কালুর নামে। খুলে দেখে অ্যাটর্নির চিঠি। পল্লব দত্তর হয়ে অ্যাটর্নি নোটিস দিচ্ছে, পৈতৃক বাড়িতে দুই ভাইয়ের সমান অধিকার। বর্তমান মূল্যে জমি আর বাড়ির দাম ধরে তার ক্লায়েন্ট অর্ধেক টাকা দাবি করছে, অন্যথায় বিধিমত বাড়ি পার্টিশন করে সে তার অংশ বিক্রি করে দেবে। এতদিনের মধ্যে প্রস্তাব-সহ জবাব না পেলে সে আইনের সাহায্য নিতে বাধ্য হবে।

এই নোটিস পেয়ে কালু সত্যি চিন্তিত। তিন ঘরের বাড়ির পার্টিশনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। দাদার অংশ নিতে হলে এই বাজারে জমি আর বাড়ির যা দাম তাতে অনেক টাকার দরকার। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে যতটা সম্ভব ধার করে আর বাকি টাকা অফিসেরই বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ দেখছে না।

…সব শোনার পরেও অবন্তী অবিচলিত। বলেছে, তোমাকে অত ভাবতে হবে না, রেজিস্ট্রি চিঠিটা আমাকে দাও।

কালু সকাল ন'টার মধ্যে খেয়ে দেয়ে অফিসে চলে যায়। আলোরও প্রায় তখনই স্কুলে যাবার সময়। কালু ফেরে সন্ধ্যায়। আর আলো বিকেল পাঁচটা নাগাদ।

কালু বাড়ি ফিরতে অবন্তী তাকে জানালো, আর তোমাকে কিছু ভাবতে

হবে না, সব ঠিক হয়ে গেছে।

নিশ্চিন্ত হবার বদলে কালুর মাথায় প্রথমে আকাশ ভেঙে পড়ল। বউদি কি তার শেষ সম্বল পঞ্চাশ ভরি সোনা আর ব্যাঙ্কে যা আছে সব দিয়ে ফয়সালা করে বসল? ক্রুদ্ধ মুখে জিগ্যেস করতে অবন্তী ঠাণ্ডা জবাব দিয়েছে, সে-সব কিছু করতে হয় নি।

আমি জিগ্যেস করলাম, ওর বাবা টাকা দিয়ে রফা করতে রাজি হলো?

কালু জবাব দিলো, না, দাদাকে ছেড়ে আসার পর থেকেই বউদির সঙ্গে বাপের বাড়ির আর কোনো সম্পর্ক নেই। অদূরদর্শিতার জন্য তার বাবা আর দাদারা বউদিকে খুব বকাবকি করে সাহায্যের নামে মা-মেয়েকে বাড়িতে আশ্রয় দেবার উদারতা দেখাতে চেয়েছিল। বউদি বলেছিল, তোমরা আর এমন অপদার্থ মেয়ের মুখ দেখো না, আমিও দেখাতে যাব না। লুকিয়ে চুরিয়ে এক-আধ সময় তার মা-ই শুধু বেহালার বাড়িতে মেয়ে আর নাতনীকে দেখতে আসেন, আর কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।···মা গোড়ায় গোড়ায় মেয়ের হাতে হাজার দু'হাজার টাকা গুঁজে দিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। মেয়ে বলে দিয়েছে, ফের এ-চেষ্টা করলে তোমার সঙ্গেও আর আমি কোনো সম্পর্ক রাখব না।

জিগ্যেস করলাম তাহলে একদিনের মধ্যে ফয়সালা হলো কি করে?

কালু বলল, আমারও সেই সন্দেহ দেখে বউদি দুটো খাম এনে আমার হাতে দিলো। একটা সকালের সেই রেজিস্ট্রি নোটিস। দ্বিতীয় খাম খুলে আমি হাঁ। সেই অ্যাটর্নির প্যাডে তারই সিল্-এর ওপর স্বাক্ষর করা চিঠি। তাতে লেখা, ওমুক তারিখের লেখা নোটিস এই চিঠিতে তার ক্লায়েণ্ট বিনা শর্তে উইথড্র করে নিলো। বেহালার ওই বাড়ির ওপর আর তার কোনোরকম দাবি থাকবে না। ওই বাড়িতে তার অংশ সে তার এক-মাত্র কন্যা আলো দত্তকে নিঃশর্তে দান করে দিচ্ছে। এই দানপত্রও যথাশীঘ্র সম্পন্ন করে পাঠানো হচ্ছে।

—বলো কি ! আমারই বিস্ময়ের অন্ত নেই।—এক বেলার মধ্যে এ কি করে সম্ভব হলো ?

কালু হাসতে লাগল।—আমারও তো তখন আপনার মতোই অবস্থা। জেরায় জেরায় অস্থির করে তোলা সত্ত্বেও বউদি কিছু বলে না, কেবল হাসে। শেষে আমি রাগ করে বললাম, আমাকে তাহলে তুমি খুব আপনার জন ভাবো না—ব্যাপারটা আমার কাছে গোপন করাই দরকার ?

তখন বলতে বাধ্য হলো।

আমি বাধা দিলাম, আগে একটা কথা বলে নাও, মেয়ের নামে সেই দান-পত্র এসেছে ?

—সাতদিনের মধ্যে একেবারে কমপ্লিট হয়ে এসেছে। রেজিস্ট্রেশন পর্যন্ত।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।—এবারে বলো, একদিনের মধ্যেই এতটা সম্ভব হলো কি করে ?

কি করে শোনার পর আমিও নির্বাক স্তব্ধ খানিকক্ষণ।

···কালু আর আলো বেরিয়ে যাবার পরই অবন্তী বাড়ি তালা দিয়ে বেরিয়েছে। একবার বাস বদলে সোজা পল্লবের গল্‌ফ ক্লাবের বাড়িতে গেছে। তার হাত ব্যাগে ওই রেজিস্ট্রি চিঠি। দোতলায় উঠে পুরনো চাকরের মুখে শুনেছে, কর্তা আর অন্যজন বাড়িতেই আছে। (চাকর নামটা মুখে আনে নি)। অবন্তী সোজা এগিয়ে গিয়ে পর্দা না সরিয়ে দরজার কড়া নেড়েছে। উর্মিমালা উঠে এসে তাকে দেখে কয়েক পলকের জন্য জড়সড়, তারপরেই সামলে নিয়েছে। হাসিমুখে আহ্বান জানিয়েছে, আসুন।

ভিতরে ঢুকে সোজা পল্লবের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সে-ও বিস্মিত, সচকিত।

অবন্তী ঘাড় ফিরিয়ে উর্মিলাকে বলেছে, এর সঙ্গে আমার কথা আছে, তুমি যাও—

উর্মিমালার সুন্দর মুখ ঘোরালো হয়ে উঠেছে। শ্লেষের সুরে বলেছে, আমাকে ঘর ছেড়ে যেতে হবে এমন কথা।

—হ্যাঁ, এ-রকমই কথা, আর পাঁচ সেকেণ্ড দেরি করলে আমি তোমাকে অন্যভাবে বার করার ব্যবস্থা করব।

উর্মিমালার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরেছে কিন্তু ঘর ছেড়ে চলে গেছে। অবন্তী পল্লবের মুখোমুখি বসে হাত ব্যাগ থেকে রেজিস্ট্রি খাম বার করেছে, জিগ্যেস করেছে এই নোটিস অ্যাটর্নি দিয়ে সে-ই পাঠিয়েছে কিনা। পল্লব জবাব দিয়েছে, সে না পাঠালে কালু এটা পেল কি করে?

—এতে যা লেখা আছে তাই হবে তাহলে?

—সে-রকম ইচ্ছে নিয়েই তো লেখা।

—কবে পর্যন্ত হবে?

—নোটিসের মেয়াদ ফুরোলে—

অবন্তী ধমকে উঠেছে। —আমার দিকে তাকিয়ে কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?

আঁতে লাগতে সদর্পে তাকিয়েছে। হাসতে চেষ্টা করেছে।—তোমাকে আমি ভয় করি ভাব নাকি?

—ভাবি না। আজকাল খবরের কাগজ পড়ো, না তারও সময় পাও না?

—তার মানে, এক্ষুনি তুমি আমার সঙ্গে বেরিয়ে অ্যাটর্নিকে দিয়ে এই নোটিস উইথড্র না করলে আমার এই সিঁথি ছুঁয়ে তোমাকে বলছি কাল বা পরশুর কাগজ খুলে তুমি দুটো মৃত্যুর খবর দেখবে।·· একটা খুন, অন্যটা আত্মহত্যা। আলোকে খুন করে কেন আমাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে, পুলিশের কাছে তার কারণও পোস্টে পৌঁছুবে!

পল্লব বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।—অবন্তী, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে।

আলোর মুখ চেয়ে এখনো আমি মাথা ঠিক রাখতেই চেষ্টা করছি, দু'দিন

পরে আর ঠিক থাকবে না।···তুমি এক্ষুনি উঠবে কি উঠবে না?
উঠেছে। উর্মিমালা জ্বলন্ত চোখে দুজনকে একসঙ্গে বেরিয়ে নিচে নেমে যেতে দেখল। নতুন কেনা চকচকে ফিয়াট গাড়িতে উঠতে দেখল। ড্রাইভারের আসনে পল্লব, পাশে অবন্তী।
গাড়ি খানিক এগোতে অবন্তী বলল, মদ খাইয়ে তোমাকে উত্তেজিত করে করে উর্মি কবে পর্যন্ত আবার এ-রকম অ্যাটর্নির নোটিস দেওয়াতে পারবে সেটাও তোমার ভেবে রাখার আজই শেষ দিন, দ্বিতীয় বারে আর আমি তোমার কাছে আসব না!
কালুর কাছে অবন্তী এ-ও স্বীকার করেছে, এ-কথা শুনেও তার দাদার হাতের স্টিয়ারিং কেঁপে গিয়েছিল!
···তারপর যা তা-ই। বাড়ির অর্ধেক অংশের মালিক এখন আলো।
আমি বলে উঠেছিলাম, কি সর্বনাশ, অবন্তী সিঁথির সিঁদুর ছুঁয়ে এ-রকম বলল, তোমার দাদা যদি তার কথা না শুনত?
কালু হাসতে লাগল। সে-ও নাকি ঘাবড়ে গিয়ে অবন্তীকে এই এক কথাই বলেছিল। তাতে নাকি অবজ্ঞার সুরে অবন্তী বলেছে, তোমাদের পুরুষের যে কি বুদ্ধি, তাকে আমার কথা শুনতে হবে আর যা বলি তাই করতে হবে এ-সম্বন্ধে হানড্রেড পারসেন্ট সিওর না হলে আমি এমন করতাম না, এ-রকম বলতাম?
আমি ভেবে পেলাম না জন্ম থেকে দেখা এই অবন্তীকে আমার এখনো চিনতে বাকি কি না।
যাবার আগে কালু বলে গেল, এত বুদ্ধি এত ব্যক্তিত্ব আর ভিতরে এত তেজ সত্ত্বেও তার ভিতরে একটা আশ্চর্য বিশ্বাস কাকু।···আমি যখন বেশি রাগারাগি করি, সে হাসে, বলে, রাহু চন্দ্র-সূর্য গেলে কিন্তু তল করতে পারে না—তোমার দাদাকেও কলঙ্কমুক্ত হতেই হবে, ভিতর থেকে তাকে ফিরতেই হবে। সেরকমভাবে সে কলঙ্কমুক্ত হবে আর ফিরবে

বলেই হয়তো এ-রকম গ্রহের ফেরে পড়া দরকার হয়েছে—ভিতরের মানুষটাকে আমার দেখা আছে।

মনে পড়ল। এ-রকম বিশ্বাসের কথা অবন্তী আমাকেও বলেছিল।

৬

চাকরিটা হবার পরেই অবন্তী একবার এসে দেখা করে গেছল। তখন ওর কপালের সিঁদুর-টিপ আর সিঁথির সিঁদুর যেন আরো জ্বলজ্বলে মনে হয়েছিল। মাস দুই আড়াই বাদে ওকে একটা পোস্টকার্ড লিখে-ছিলাম। কারণ ওদের স্কুলের হেডমিসট্রেস তার নিজের কোনো দরকারে আমার কাছে এসেছিল আর তখন সত্যি অবন্তীর খুব প্রশংসা করে গেছল। সে-কথাই ওকে লিখেছিলাম। আর সকলের কুশল জানতে চেয়েছিলাম। চিঠি পেয়েই জবাব দিয়েছিল। মজা করে লিখেছে, আমাদের হেডমিসট্রেসটি ভালো মানুষ তবে স্কুলের সর্বব্যাপারে একটু বেশি কড়া মানুষ। তবু তাঁর কাছে আমি যেটুকু খাতির পাই আমার ধারণা সে-কেবল তোমার দৌলতে। তোমার কাছে আমার প্রশংসা করলে আর সে-প্রশংসায় তুমি খুশি হলেও তাঁর লাভ কিছু আছে কিনা সে-শুধু তুমিই জানো। আমার দিক থেকে বলতে পারি ছোট-ছোট এতগুলো ছেলেমেয়ে পেয়ে ভালো লাগছে এটা সত্যি কথা।

আমাদের কুশল বলতে কালু আলো আর আমিও ভালোই আছি। কিন্তু যে রকম কুশল খবর পেলে তোমার মন ভরে তা এখনো দিতে পারছি না।

এরপর একে একে অনেকগুলো বছর গড়িয়েছে। নববর্ষ আর বিজয়ার পরে দুটো করে প্রণামের চিঠি কেবল পাই। তাতে লেখে আমাদের একভাবেই চলেছে।

পল্লব অথবা ঊর্মিমালার অভিনয়ের খবর সম্পূর্ণই রাখি। সিনেমার নয়, বরাবরই থিয়েটার দেখার বেশি শখ। শুধু অবন্তিকার কেন, ফাঁক পেলে

অনেক নামী গোষ্ঠীরই নতুন প্রোগ্রাম থাকলে দেখতে যাই। না, অবন্তিকার আমন্ত্রণ পত্র আর আমার কাছে আসে না। আসা না আসার পরোয়া করি না। যখন যাই, প্রথম সারির টিকিট পেতেই চেষ্টা করি। পল্লব কখনো আমাকে লক্ষ্য করেছে কিনা জানি না। কখনো ধারে কাছে আসে নি।

…এত বছরে উর্মিমালার অভিনয়ের ধার অনেক বেড়েছে সন্দেহ নেই। তবু ব্যক্তিগত আক্রোশের ফলে কিনা জানি না, আমার মনে হয় দর্শকচিত্তে তার প্রতিষ্ঠার আসন রূপ যৌবনের জন্য যত, শিল্পকলার গভীরতার জন্য ততো নয়। আরো মনে হয় ওই রূপ-যৌবন দিয়ে দর্শকের চোখ লালায়িত করার সংগোপন অথচ সহজ কৌশলও সে রপ্ত করেছে। রাগ অনুরাগ বা হেসে লুটোপুটি খাওয়ার দৃশ্যে স্খলিত বসন সচকিতে বিন্যস্ত করা দেখে দর্শক যে মুগ্ধ হয়, সেটা আমার বিবেচনায় অন্তত সুচারু বা সাবলীল অভিনয়ের কারণে নয়।

অন্যদিকে, পল্লব দত্তকে চেষ্টা করেও খুব বেশিক্ষণ পর্যন্ত তার ভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারি না। তার ওপর আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ উর্মিমালার থেকেও ঢের বেশি। কিন্তু মঞ্চে এসে দাঁড়ালে খানিকক্ষণের মধ্যেই ভুল হয়ে যায়। মঞ্চে যাকে দেখি সে আর পল্লব দত্ত থাকে না, ভূমিকা-চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। অবন্তী যে-শিল্পীর মধ্যে বিরাট সমুদ্র দেখার কথা বলে, তখন তেমনি অকৃত্রিম বিরাটই মনে হয় তাকে। ফলে অভিনয় শেষ হবার পরে ওই লোকটার ওপর আমার দ্বিগুণ বিদ্বেষ।

অবন্তীর কালে অবন্তিকার জয়-যাত্রার সূচনা ছিল, এখন সেটা পরি-পূর্ণতার দিকে।

বেহালা দূরের পথ নয়। তবু আটটা বছর কেমন করে কেটে গেছে, অবন্তী বা কালু কারো সঙ্গেই দেখা হয় নি। মাঝে মাঝে ওদের কথা

মনে হয় না এমন নয়। নববর্ষ বা বিজয়ার চিঠি পেলে বিশেষ করে মনে হয় একবার গিয়ে ওদের দেখে আসি। আবার ভাবি কি দেখতেই বা যাব। উল্টে কোনো পুরনো প্রসঙ্গ উঠলে ক্ষতর ওপর আঁচড় পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। চিঠির জবাব দিই। সুবিধেমতো মেয়ে নিয়ে ওকে আসতেও লিখি। দু'বছর আগে লিখেছিলাম, তোর মেয়েকে সেই তিন মাস বয়সে একবার মাত্র দেখেছি, পাছে নাতনী লেখক দাদুর প্রেমে পড়ে যায় এই ভয়েই আনিস না নাকি ?

তার জবাবে অবন্তী লিখেছিল, নিয়ে আসবে, তবে মেয়েটা এক স্কুল ছাড়া ঘরের বাইরে কোথাও যেতে চায় না। কেন, বুঝতেই তো পারো। তবে ওকে দেখলে তুমি প্রেমে পড়তেও পারো, ওকে নিয়ে ভয়ে দুশ্চিন্তায় আমি নাজেহাল হয়ে গেলাম।

তিন মাসের মেয়েকে কি উপলক্ষে দেখেছিলাম মনে আছে। দেওরকে আর ওই মেয়েকে নিয়ে অবন্তী ওদের অবন্তিকার যাত্রারম্ভ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার আর্জি নিয়ে এসেছিল। তখই মনে হয়েছিল মেয়েটা বয়েস কালে রূপসী হবে। অবন্তীর ওই চিঠিতে মেয়ে নিয়ে ভয় দুশ্চিন্তা আর নাজেহাল হবার কথা পড়ে মনে হয়েছিল মেয়ে রূপসীই হয়েছে। বাপের রং আর মায়ের মুখ পেলে না হবার কারণ নেই।

···আট বছর বাদে অবন্তীকে আমার বাড়ির দরজায় ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখলাম। কাঁধে একটা সুন্দর ঝোলানো ব্যাগ। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দোতলার দিকে তাকাতে আমি হেসে বললাম, ঠিক বাড়িতে নেমেছিস তো, না ভুল করে নেমে পড়লি ?

ও হেসে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু এটুকুর মধ্যেই কিছু চোখে পড়তে আমি নিশ্চল কয়েক মুহূর্ত। অবন্তীর কপালের আর সিঁথির সিঁদুর আকারে বাড়ছে আগেই লক্ষ্য করেছিলাম। এখনও ওপর দিকে তাকাতে কথা বলার ফাঁকে লক্ষ্য

করলাম, কপালের জ্বল-জ্বলে সিঁদুরের টিপ প্রায় একটা আধুলির মতো। সিঁথির সিঁদুরও সেই অনুপাতে চওড়া মোটা দাগের। দেখা-মাত্র বুকের ভেতরটায় মোচড় দিয়ে উঠেছে।

নিজের ঘরে এসে দাঁড়ানোর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অবন্তী এলো। এখনো মোটামুটি সুঠাম স্বাস্থ্য, কিন্তু কপালের ওই মস্ত সিঁদুরের টিপ ওকে যেন অসময়ে ঠাকুমা-দিদিমার কালের দিকে টেনেছে। পরনেও চওড়া লাল পেড়ে কোরা শাড়ি।

নত হয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, তারপর হাসিছোঁয়া মুখে আমাকে যেন নিরীক্ষণ করল একটু।—তুমি একটু বুড়িয়ে গেছ কাকু, কাকিমা যত্ন-আত্তি করে না নাকি? কোথায়?

—কাছেই তার ভাইয়ের বাড়িতে গেছে, আধঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে যাবে—তা আট বছর বাদে এসেও তুই যাই-যাই করবি না ডেকে পাঠাবো।

অবন্তী হেসেই জবাব দিলো, আছি কিছুক্ষণ, তুমি আমার ওপর রেগে আছ কাকু, না? ভাবছ চাকরি-বাকরি দিলাম, মেয়ের আর দেখাই নেই—

—খুব চাকরি আর খুব বুঝছিস। বোস্—এবারেও মেয়েটাকে আনলি না?

—হুঁঃ, আগেই আনা গেল না, এখন তো আর এসেছে—

মুখোমুখি সোফায় বসে কাঁধের ব্যাগ কোলের ওপর নামালো। তার ভিতর থেকে একটা লম্বাটে রঙিন খাম বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিলো, এই নাও—কাল বুধবারের পরের বুধবার ওর বিয়ে।

খাম হাতে নিয়ে আমি হাঁ।—বলিস কি রে! এরই মধ্যে ওর বিয়ে—কত বয়েস হলো ওর?

—তা খুব কম কি, আঠারো পেরিয়ে উনিশ চলছে, আর ক'দিন বাদে হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট বেরুবে—

—এখনো কলেজে ঢোকে নি এরই মধ্যে বিয়ে···এত তাড়ার কি ছিল?

—রক্ষে করো কাকু, আরো পাঁচ বছর আগে থেকে আমার বুকের তলায় ত্রাস। পাড়ার ছেলেগুলোর বাড়ির সামনে আড্ডা, ট্রামে স্কুলে যেতে আসতে যত রকমের উৎপাত—ঈশ্বর জুটিয়ে দিলেন যখন নমো-নমো করে দিয়ে ফেলে বাঁচি। মেয়ের বাঘিনীর মেজাজ বলেই রক্ষে।

মেয়ে রূপসী হলে আজকালকার বাপ-মায়ের এ-রকম উৎপাত এড়ানোর উপায় নেই। বিশেষ করে তাকে যদি ট্রাম, বাসে স্কুল-কলেজ যাতায়াত করতে হয়।

তবু চোখে দেখি নি বলেই জিগ্যেস করলাম, তোর মেয়ে দেখতে খুব সুন্দরী হয়েছে নিশ্চয়?

হাসল।—আমি তো সুন্দরই দেখি, পাশাপাশি দেখলে গায়ের রং দেখে আমার মেয়ে কেউ ভাববে না।

খামটা খুলে পড়লাম। ছেলে নাম বিকাশ বসু। দক্ষিণ কলকাতার দিকে বাড়ি। স্বর্গীয় ওমুকের তৃতীয় এবং কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে আমার একমাত্র কন্যা আলোর বিবাহ, ইত্যাদি। শেষে, বিনীত পল্লব দত্ত।

···মেয়ের বিয়ের চিঠি বাপের নামেই ছাপা হয়ে থাকে। তবু ওই নামের ওপর আমার চোখ দুটো হোঁচট খেলো।

চিঠি খামে পুরে জিগ্যেস করলাম, ছেলেটি কি করে?

': কস্ট অ্যাকাউনটেণ্ট। এমনিতে এম. এ. কমার্স, বি.কম. পড়তে পড়তে কস্ট অ্যাকাউনটেন্সি পড়া শুরু করেছিল। একই বছরে এম. এ. কমার্স আর কস্ট অ্যাকাউনটেন্সি পাশ করে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পেয়েছে।

': বয়েস কত?

অবন্তী বলল, বয়সের ফারাক আজকালকার দিনে একটু বেশি—আঠাশ ···তবে আমার এটাই পছন্দ।

': বেশ। সম্বন্ধ তুই জোটালি না কালু?

অবন্তী হেসে উঠল।—ছেলে নিজেই এসে জুটল।

আমি সচকিত একটু। ইতস্তত করে জিগ্যেস করলাম, তার মানে তোর মেয়ে নিজেই ঠিক করেছে?

আবারও হাসি।—তার মানে কি তাই হলো! আমার মেয়ের মনের বা চোখের ত্রি-সীমানায়ও ওই ছেলে কখনো ছিল না, কিন্তু মেয়ে দু'বছর ধরে ওই ছেলের মনের আর চোখের আওতায় ছিল—সে বড় মজার ব্যাপার কাকু—আমার মন বলল ভালো হবে, লাগিয়ে দে—তাই দিলাম।

ওর মনের বলার ওপর আমার খুব আস্থা আর নেই। ওর মন এখনো কিছু বলে বলেই আজও কপালে সিঁথিতে অমন জ্বলজ্বলে সিঁদুর। যাক, শোনার কৌতূহল তা বলে কম নয়। সেই সঙ্গে সংশয়ও, এই মেয়ে আবেগের বশে আবার কোনো ভুলের ফাঁদে পা দিলো কিনা। সহজভাবেই বললাম, আমার যখন নাতনী, মজার ব্যাপার শোনার রাইট্ আমারই সব থেকে বেশি—বল্ সব, শুনি।

মজার ব্যাপার তো বটেই, শোনার পর আমারও সত্যিই মনে হলো, এই এক ব্যাপারে অন্তত বিধাতা এই দুখিনী মায়ের মুখ চেয়েছে। চিত্রটা তুলে ধরছি :

···মেয়ে আলো মায়ের মতোই লম্বা, ভালো স্বাস্থ্য। বয়েস অনুপাতে বাড়ন্ত গড়ন। তাই দশ ক্লাসে উঠতেই অবন্তী স্কুলের স্কার্ট ব্লাউস ড্রেস ছাড়িয়ে তাকে সাদা জমিনের বেগনে পাড়ের শাড়ি আর বেগনে রঙের ব্লাউস ধরাতে চেয়েছিল। বড় মেয়েদের সেটাই স্কুল ড্রেস। কিন্তু মেয়ের আপত্তি শাড়ি পরলে চলতে ফিরতে বা ট্রামে যাতায়াত করতে অসুবিধে হয়। কিন্তু এগারো ক্লাসে পা দিয়ে আলোকে শাড়ি ধরতেই হলো। ওকে ভালোবাসে স্কুলের এমন দু'দুজন টিচার ওকে আড়ালে ডেকে বলেছে, আর স্কার্ট ব্লাউস নয়, এখন থেকে শাড়ি পরা শুরু করো।

অবন্তীও তাই চেয়েছিল বটে কিন্তু মেয়ে শাড়ি ধরার পর তার বুকের কাঁপুনি ডবল বেড়েছে। এরপর পাড়ার ছেলেদের উৎপাত শুধু বাড়লো না, পথে চলাফেরা বা ট্রামে বাসে নিজেকে আগলে রাখার দ্বিগুণ দায়িত্ব যেন মেয়েটার কাঁধে চাপানো হলো। ভয়টা অবন্তী কেবল দেওরের কাছেই প্রকাশ করত। বলত, এখন থেকেই ভাইঝির একটা ভালো সম্বন্ধ দেখতে থাকো—

কালু কখনো হাসত, কখনো রেগে যেত। বলত, তোমার থেকে আলো নিজেকে ঢের বেশি আগলে চলতে পারে—ও এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে বেরুবার আগে ওর বিয়ের কথা আমি ভাববই না। আর মাঝে মাঝে আলোকেই বলত, কেউ তোর সঙ্গে এতটুকু অসভ্যতা করছে মনে হলেই আমাকে বলবি, ফ্যাক্টরী কামাই করে তো সঙ্গে গিয়ে তার মাথাটা ছিঁড়ে নিয়ে আসব।

ভাইঝি'র সঙ্গে কাকার দারুণ ভাব। ও হি-হি-করে হাসে। কিন্তু কাকার কাছে কারো নামে নালিশ কখনো করে নি। মা-কে বলে, কত রকমের অসভ্যতা আছে কাকু যদি জানত তাহলে যাতায়াতে ট্রামে ওঠার সময় যারা পিছন পিছন আসে তাদের কুকুর-তাড়া করতে হতো, ইচ্ছে করে যারা একটু আধটু ধাক্কা দেবেই রোজ এমন জনাকতকের হাত-পা ভেঙে দিতে হতো, আর প্রত্যেক দিন চল্লিশ পঞ্চাশ জনের অন্তত চোখ গেলে দিতে হতো।

মায়ের প্রশ্ন, তুই কি করিস ?

': পৃথিবীতে এক আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নেই এমন ভাব দেখাই। কি আর করব ?

...অবন্তীরও ইচ্ছে মেয়ে অনেক পড়াশুনা করুক। স্কুলে কখনো প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হয় না। তবু তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় কেবল ভয়ে।

আলোর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা হয়ে যাবার দশ দিনের মধ্যে স্কুল থেকে ফিরে অবন্তী খামে একটা চিঠি পেল। ডাকে এসেছে। অপরিচিত হাতের নাম ঠিকানা লেখা। খুলে পড়তে পড়তে অবাক। 'শ্রীচরণেষু মা' বলে শুরু। কে হতে পারে ভেবে না পেয়ে অবন্তী নিচের নাম দেখল। বিকাশ। ব্র্যাকেটে বসু। আরম্ভটাই একটু অদ্ভুত—'গত এক বছর ধরে অনেক ভেবে আপনাকে এই চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তার আগে আপনি স্কুল থেকে ফেরার সময় আপনাকে লক্ষ্য করেছি। ছেলেবেলা থেকে আমার বাবা-মা নেই, প্রথমে কাকা এবং পরে দাদাদের কাছে মানুষ। আপনাকে দেখে আমার মায়ের মতো মনে হয়েছে তাই সাহস করে এই চিঠি লিখছি। আমার বয়েস আঠাশ। আড়াই বছর আগে একসঙ্গে এম. এ. কমার্স আর কস্ট অ্যাকাউনটেন্সি পাশ করে একটা বড় ফার্মে পাকা চাকরিতে ঢুকেছি। আপনার সঙ্গে আমার একবার দেখা করা খুব প্রয়োজন। আমার বক্তব্য আপনার পছন্দ না হলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাকে বিদায় করে দেবেন। তাতে আর কিছু না হোক আমার মানসিক অনিশ্চয়তা দূর হবে। ওপরের ঠিকানা আমার পৈতৃক বাড়ির। আপনার সুবিধেমতো দয়া করে ফোনে অথবা চিঠি দিয়ে পাঁচ-দশ মিনিটের জন্য এই অচেনা ছেলেকে একবার দেখা করার অনুমতি দেবেন এই আশায় রইলাম।'

ওপরে বাড়ির ঠিকানা দেখে অবন্তীর খটকা লাগল। দু'বার করে পড়ে চিঠি খামে পুরে মেয়েকে জিগ্যেস করল, তোদের স্কুলের ঠিকানা কি রে? আলো ঠিকানা বলল, একই রাস্তার নাম।

': তাহলে এই রাস্তায় এই নম্বরের বাড়ি কোথায় হবে?

': বে-জোড় নম্বর, রাস্তার উল্টো দিকে কোথাও হবে ···কেন?

': দরকার ছিল।

': তাহলে চলো একসঙ্গে চলে যাই, ওই রাস্তার ঠিকানা বার করতে আর

অসুবিধে কি।

কথার ফাঁকে মেয়েকে ভালো করে নিরীক্ষণ করেছে অবন্তী। কোনো-রকম বিস্ময়ের আঁচড় পড়তে দেখে নি। ফাঁকমতো ওই চিঠি আরো অনেক বার পড়েছে।...ট্রামে বা বাসে অত দূর থেকে এসে এই অচেনা ছেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর তাকে লক্ষ্য করেছে। তারপর এই চিঠি লিখে দেখা করার অনুমতি চেয়েছে।...সমস্যাটা ওই ছেলেরই, কারণ, লিখেছে আর কিছু না হোক তার মানসিক অনিশ্চয়তা দূর হবে। অশিক্ষিত ছেলে নয় যে হাল্কা কোনো কারণে এই আকুতি। তাছাড়া, ছেলেবেলা থেকে বাবা-মা নেই বলে হোক বা মা বলে সম্বোধন করার জন্যে হোক ছেলেটার সম্পর্কে কৌতূহল হচ্ছে। আভাস-মাত্র না থাকলেও অবন্তীর বার বার মনে হচ্ছে এভাবে দেখা করতে চাওয়ার পিছনে তার মেয়ের কোনো যোগ আছে।

কৌতূহলই বড় হলো শেষ পর্যন্ত। ছোট্ট জবাব লিখল, চিঠি পেয়ে খুব অবাক হয়েছে, দেখা করতে চাওয়ার কারণও ভেবে পাচ্ছে না। যা-ই হোক, আগামী রবিবার বিকেল পাঁচটায় সে এসে দেখা করে যেতে পারে।

ক'দিন আগেই নিজের আর মেয়ের জন্য দুখানা করে শাড়ি আর ব্লাউস কেনার কথা বলেছিল। কালুকে রবিবার সকালেই বলে রেখেছিল বিকেলে আলোকে নিয়ে একবার বেরুতে হবে। কাপড় জামা মা-ই কিনে থাকে, আলো বলল, আমি কি আনব না আনব, তুমিও চলো না—

': বড় হয়েছিস্, নিজের পছন্দেই কিনবি এবার থেকে, আমার জন্য কালো ছাড়া অন্য রং-এর চওড়া ছাপা পাড় পাতলা সাদা জমিনের শাড়ি আনবি দুখানা—পছন্দ না হলে আবার বদলে নেবার কথাও বলে আসবি।

/পৌনে পাঁচটার মধ্যে কাকা ভাইঝিকে বাড়ির বার করল।

ঠিক পাঁচটাতেই সেই ছেলে এসে দরজার কড়া নাড়ল। অবন্তীই দরজা খুলল। বেশ সুশ্রী ছেলে, স্মার্টও হয়তো, কিন্তু মুখে সংকোচের ছাপ স্পষ্ট। পরনে টেরিকটের ট্রাউজারস, গায়ে ডোরাকাটা চকচকে হাফ-হাতা বুশ শার্ট। হাতে ঘড়ি। পায়ে স্ট্র্যাপ লাগানো জুতো।

‘: বিকাশ··· ?

‘: আজ্ঞে হ্যাঁ··· ।

‘: এসো।

অবন্তী আগে আগে দাওয়ায় উঠল। বারান্দাতেই দুটো চেয়ার পেতে রেখেছিল। ছেলেটি প্রণাম করার জন্য এগিয়ে আসতে বলল, থাক, বোসো—

ছেলেটা আর প্রণাম করতে চেষ্টা না করে বসল। মুখোমুখি চেয়ারে বসে অবন্তী জিগ্যেস করল, কি ব্যাপার বলো তো··· ?

স্মার্টই মনে হয় তবু ছেলেটা ঘামছে মনে হলো। ইয়ে, কি-ভাবে যে বলি ···আপনি আমাকে কোনো ইতর ছেলে না ভাবেন···আপনার মেয়ে যে স্কুলে এতদিন পড়ে এসেছে, সেই স্কুলের উল্টো দিকেই আমাদের বাড়ি···আজ দু'বছরের বেশি হলো ট্রাম স্টপে নেমে তাকে হেঁটে স্কুলে যেতে দেখি···আর কোনো কোনোদিন আমার আগে অফিস ছুটি হয়ে গেলে বাড়ি ফিরেও তাকে স্কুল থেকে বেরিয়ে ট্রাম-স্টপ থেকে ট্রাম ধরতে দেখি···

‘: কেন ছাখো ?

ছেলের কপালে ঘাম। বিশ্বাস করুন, আমি অভদ্র ছেলে নই, তবু সে সময় বারান্দায় না দাঁড়িয়ে পারতাম না···আমার ইয়ে ··ভালো লাগত। তাছাড়া প্রায়ই দেখতাম, আলো ট্রাম থেকে নামলে কয়েকটা পাড়ার ছেলে তার পিছু নেয়, ঠাট্টা-ইয়ারকি করতে চেষ্টা করে, আলোকে একা ট্রাম থেকে নামতে দেখলে আমি তাড়াতাড়ি নেমে যেতাম, ওরা আমাকে

চেনে, আমাকে দেখলে ওরা আর টীজ্‌ করত না।···আলো জানে একদিন বাড়াবাড়ি করছিল বলে আমি ওদের মারতে গেছলাম।

': আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে ?

': না···ওই সেই দিনই আলাপ করতে চেষ্টা করেছিলাম, ও ঝাঁজালো জবাব দিয়ে স্কুলে ঢুকে গেছল···আমাকেও ওই ছেলেদের মতোই একজন ভেবেছিল হয়তো।

': তুমি কি ভাবে চেষ্টা করেছিলে আর ও কি বলেছিল ?

এখন জেরায় পড়ে ছেলেটা অসহায় আর চুপ। অবন্তী আরো গম্ভীর।

': বাড়ি বয়ে এসেছ যখন যা জিগ্যেস করছি জবাব দাও!

অগত্যা জানিয়েছে কি-ভাবে আলাপের চেষ্টা করেছিল আর আলো কি জবাব দিয়েছে। সঙ্গ নিয়ে ও হেসে বলেছিল, প্রায়ই লক্ষ্য করে ছেলে-গুলো খুব জ্বালায়, এরপর আর সাহস পাবে মনে হয় না। আলো কোনো দিকে না তাকিয়ে স্কুল গেটের কাছে এসেছে। এই ছেলে তখন উল্টো দিকের বাড়িটা দেখিয়ে বলেছিল, সে ওই বাড়িতে থাকে। আলো তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝাঁজালো গলায় বলেছে, তাতে কি ?

তারপরেই ভিতরে ঢুকে গেছে।

অবন্তীর পরের ঠাণ্ডা প্রশ্ন, আলাপ হয় নি কিন্তু আমার মেয়ের তুমি নাম জানলে কি করে ?

': ওর এগারো ক্লাস থেকে বারো ক্লাসে ওঠার অ্যানুয়াল ফাংশনের সময় জেনেছি। ছোড়দার বাচ্চা মেয়ে ওই স্কুলেই পড়ে, সেবারে ছোড়দার বদলে আমি গেছলাম। প্রাইজ নেবার জন্য তিন বার আপনার মেয়ের ডায়াসে ডাক পড়েছিল, প্রথমে ফার্স্ট প্রাইজ নেবার জন্য, তারপর ল্যাঙ্গুয়েজে ফার্স্ট প্রাইজ নেবার জন্য···শেষে রেগুলার অ্যাটেনডেন্স প্রাইজ নেবার জন্য।

': তুমি এ বাড়ির ঠিকানা পেলে কোথায় আর আমার নামই বা জানলে

কি করে ?

জেরায় জেরবার হবার ফলে ছেলেটাও একটু বেপরোয়া হয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। সোজা জবাব দিয়েছে, শুনতে আপনার খারাপ লাগবে, আপনার মেয়েকে একদিন আমি ট্রামে এই বাড়ি পর্যন্ত ফলো করে ছিলাম—

': মেয়ে তোমাকে দেখে নি ?

': না, যাতে না দেখে সেইজন্য আমি ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে ছিলাম··· নামার পরেও দেখে নি কারণ আপনার মেয়ে রাস্তায় চলার সময় কোনো দিকে তাকায়-না। তারপর কয়েকটা রবিবারে এসে এসে এ-দিককার খুব চেনা লোকের কাছ থেকে আপনার সম্পর্কে খবর নিয়েছি।

অবন্তীর তখনো খুব ঠাণ্ডা খুব গম্ভীর মুখ। কিন্তু রাগ বা বিরক্তির বদলে ছেলেটাকে ভালো লাগছে। তবু এই ভালো-লাগাকে প্রশ্রয় দিতে একটুও রাজি নয়।—তাহলে তোমার বক্তব্য কি, আমার মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে চাও ?

উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইলো।

অবন্তী বলল, সবে হায়ার সেকেণ্ডারি দিলো, এখনই বিয়ে দেবার কথা ভাবি নি—যদিই ভাবতে হয় তাহলে তোমার সম্পর্কেও কিছু খবর জানা দরকার—

সাগ্রহে বলে উঠলো, খবর নিন, এ-ভাবে প্রস্তাব আসাটা স্বাভাবিক নয়, খবর তো নিতেই হবে।

অবন্তী চেয়ে আছে।—আগে তোমাকেই জিগ্যেস করি···এম. এ. কমার্স আর কস্ট অ্যাকাউনটেন্সি কোন্ ইয়ারে পাশ করেছ ?

বলল।

': কত দিন আগে চাকরিতে ঢুকেছ ?

': প্রায় তিন বছর।

': কোন্ ফার্মে চাকরি ?

বলল।

': কত মাইনে পাও ?

': সব-রকম অ্যালাউয়েন্স নিয়ে সাড়ে তিন হাজারের মতো···ভবিষ্যতে আরো অনেক ওঠার স্কোপ আছে।

মাইনে শুনে অবন্তী অবাকই হয়ে গেল। কস্ট অ্যাকাউনটেন্সির কদর তার তেমন জানা নেই। এত বছর চাকরির পর ওর স্কুলের মাইনে ছ'শ টাকা। যাক, এই বিস্ময়ের ধার দিয়েও সে গেল না। জিগ্যেস করল, বাড়িতে তোমার কে আছে ?

': দুই দাদা, দুই বউদি, তাদের ছেলে-মেয়েরা··· ।

': দাদারা কি করেন ?

': বড়দা আমাদের ওষুধের দোকান দেখেন, ছোড়দা চারটারড্ অ্যাকাউন-টেণ্ট্, আমার থেকে ঢের বড় চাকরি করেন।

': তোমার কাকার কথা লিখেছিলে, তিনি ?

': তিনি নেই। কাকিমাও নেই···আমাকে বড় ভালোবাসতেন···মা-বাবা বলতে আমার আর কেউই নেই।

ওই বিষণ্ণ মুখখানা দেখে অবন্তীর এত ভালো লাগল যে বুকের তলায় মোচড় পড়ার দাখিল। কিন্তু অবন্তী তক্ষুনি সে-ভাবও প্রকাশ করতে পারে না।

': ঠিক আছে, আমার মেয়ে বাড়ি নেই, এক্ষুনি হয়তো এসে পড়বে—এখন তুমি এসো, মন স্থির করতে পারলে চিঠিতে তোমাকে জানাবো।

ছেলেটা যা বলে উঠলো, তাতেও অবন্তীর বুকের তলায় আবার মোচড় পড়ল।—মন স্থির করতে না পেরে যদি নাকচও করেন, তাহলেও একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দেবেন মা—আমি সুস্থিরভাবে বসে অফিসের কাজকর্মও করতে পারছি না।

চুপচাপ একটু চেয়ে থেকে অবন্তী বললো, ঠিক আছে।

রাতের নিরিবিলিতে কালুর ঘরে এসে জিগ্যেস করল, এম. এ. কমার্স আর কস্ট অ্যাকাউনটেন্সি পাশ করলে বড় ফার্মে আড়াই তিন বছরের মধ্যে সব মিলিয়ে কি রকম মাইনে হতে পারে ?

কালু অবাক।—কি ব্যাপার ?

': আগে বলো না।

': তা তিন থেকে চার হাজার টাকা হবেই, খুব বড় ফার্ম হলে আরো বেশিও হতে পারে।

অবন্তী এবারে চিঠিখানা দেখালো। তারপর সেদিনের সাক্ষাতকারের আদ্যোপান্ত বলল। শোনার পর কালুর বিস্ময়ের অন্ত নেই।

এরপর অবন্তীর পরামর্শ মতোই কাজ করল সে। তিন দিনের মধ্যে সমস্ত খবর এনে চাপা খুশিতে তাকে জানালো, ছেলেটা একটাও বাজে কথা বলে নি, কলেজ য়ুনিভার্সিটির কেরিয়ার ভালো, কস্ট অ্যাকাউনটেন্সিও একবারে পাশ করেছে, বাড়ির অবস্থা খুবই সচ্ছল, ওষুধের মস্ত দোকানের আট আনার মালিক বড় ভাই, বাকি চার আনা করে অন্য অন্য দু'ভাই, অফিসে খোঁজ নিতে ওর বাঙালি বস্ এক বাক্যে ছেলের প্রশংসা করেছেন, রত্ন ছেলে ভবিষ্যতে আরো অনেক উঠবে, এমনও বলেছেন ওই ছেলে কায়স্থ না হয়ে ব্রাহ্মণ হলে নিজের মেয়ের সঙ্গেই বিয়ের চেষ্টা করতেন। ছেলের, মেয়ে পছন্দ হয়ে থাকলে নির্দ্বিধায় বিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কালু কেবল ছেলের বয়স নিয়ে একটু খুঁতখুঁত করেছে···ন'বছরের ফারাক।

অবন্তী বলেছে, সেটাই তার পছন্দ।

এরপর বিকাশকে খুব ছোট্ট চিঠি লিখেছে সামনের শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটে চারটের সময় তার স্কুলে আসা সম্ভব হলে দেখা এবং কথা হতে পারে। তারপর বেশ একটু ভেবে নিয়ে লিখল, ইতি আশীর্বাদিকা

তোমার মা।

শনিবার দুপুর দেড়টার মধ্যে স্কুল ছুটি। দু'টোর ও-দিকে টিচাররা কেউ থাকে না। থাকলেও ঘরের অভাব নেই। স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা এখন অনেক, ছুটির পর অবন্তী এক গাদা খাতা নিয়ে দেখতে বসল।

ঠিক সময় ধরে বিকাশ এলো। দরোয়ানকে বলা ছিল, সে তাকে নিয়ে এলো। টিচারস রুমে দ্বিতীয় টিচার নেই। তাকে বসিয়ে অবন্তী বলল, মেয়ে বাড়িতে। বুঝতেই পারছ সেখানে আলোচনার সুবিধে কম।

বিকাশ মাথা নাড়ল, অর্থাৎ বুঝেছে।

ছেলেটার মুখখানা একটু শুকনো শুকনো লাগল অবন্তীর। তুমি অফিস থেকে আসছ?

আবার মাথা নাড়ল। তাই আসছে।

': তোমার খিদে পেয়ে থাকলে এখানে মিষ্টি পাওয়া যার, আনিয়ে দেবো?

হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো। বলল, আজ একটা জরুরি মিটিং ছিল বলে সকাল সাড়ে আটটায় সেদ্ধ-ভাত খেয়ে বেরিয়েছিলাম···খুব খিদে পেয়েছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে অবন্তী দ্রুত বেরিয়ে গেল। একটু বাদে ফিরে এসে বলল, তোমাকে এ-সময় ডেকে কষ্ট দিলাম। গেটের বাইরেই দোকান, খাবার এক্ষুণি এসে যাবে।

': তাহলে আর কষ্ট কি···কিন্তু আমি একটু মুখ-হাত ধোব যে মা।

কোনো ছেলের মুখে আজ পর্যন্ত মা ডাক শোনে নি অবন্তী। তার বুকের তলায় অদ্ভুত শিহরণ একটু। সঙ্গে করে পাশের টয়লেট দেখিয়ে দিয়ে ফিরে এসে বসল। তার নিজেরই যেন অনিশ্চয়তার সংকট এখন।

দরোয়ান খাবার এনে ডিশে সাজিয়ে দেবার ফাঁকে বিকাশ রুমালে মুখ মুছতে মুছতে ফিরে এসে বসল।—এত খাবার এনেছে···কিন্তু আপনার

কোথায় ?

বেয়ারা দাঁড়িয়ে পড়তে অবন্তী চোখের ইশারায় তাকে যেতে বলল।—তুমি খাও।

বেশ আয়েশ করে খেতে শুরু করল। ছেলেটা খেতে ভালবাসে বোঝা গেল। একটু বাদে হেসেই বলল, কাকা অফিসে আমার বস মিস্টার চ্যাটার্জীর কাছে আমার সম্পর্কে খোঁজ নিতে গেছলেন শুনলাম···তিনিই ঠাট্টা করে জিগ্যেস করছিলেন কোথায় মেয়ে পছন্দ হলো।

'কাকা' শুনে অবন্তীর আবার মনে হলো এই ছেলে ধরেই নিয়েছে এখানে বিয়ে হবে। কিন্তু সে কি তা ধরে নিতে পারছে ?

বলল, খোঁজ নেওয়া তো স্বাভাবিক, তাই নয় ?

খেতে খেতে মাথা নেড়ে সায় দিলো। তারপর হাসিমুখেই বলল, তারা কেবল আমার চাকরি আর মাইনে-পত্র সম্পর্কেই বলতে পারে, আমি কেমন কি বৃত্তান্ত তা জানবে কি করে··· !

বলে ফেলেই নিজেই অপ্রস্তুত একটু, হয়তো মনে হলো সেধে এরকম বলাটা উচিত হয় নি। অবন্তীর মজাই লাগল। মাথা নেড়ে বলল, তা ঠিক, সে-সব জানার কি করা যায় বলো তো ?

খাওয়া থেমে গেল। বিপাকেই পড়ল একটু।—ইয়ে···বাড়িতে খবর নিতে গেলে সকলে তো ভালোই বলবে···প্রতিবেশীদের অনেকে আমাকে ছেলেবেলা থেকেই জানে···তাদের কাছে আর জানতে বুঝতে না দিয়ে আমাদের ওষুধের দোকানের পুরনো কর্মচারীদের কাছ থেকেও খবর নিতে পারেন

হাসি চেপে অবন্তী বলল, আচ্ছা তুমি খাও, সে ভাবনা তো আমাদের।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে খাওয়া শেষ করে ডিশ আর জলের গেলাস বড় টেবিলের একদিকে সরিয়ে রাখল।

এরপর অবন্তীর সোজা প্রশ্ন।—তুমি আমার মেয়ের সম্পর্কে কতটুকু জানো

…তোমার এখানকার খুব চেনা লোক কে? তাঁর কাছ থেকে আমার সম্পর্কে তুমি কি জেনেছ…শুধু স্কুলে পড়াই এ-কথা?

মাথা নিচু করে জবাব দিল, আমার এক বন্ধুর দাদা আপনাদের বাড়ির খুব কাছেই থাকেন। অবন্তীর বাবা কে উনিই বলেছেন। তিনি এখানে থাকেন না এ কথাও বলেছেন।

': তাহলে তোমার দাদাদের মনে প্রশ্ন উঠবে না? তাঁরা এ-বিয়েতে মত দেবেন?

': কার মেয়ে এটা বলতেই হবে, কিন্তু এখানে তিনি থাকেন কি থাকেন না তা এখনই তাঁদের বলার দরকার কি…। কিন্তু এ-সব নিয়ে আপনি ভাববেন না, আমি কোথায় বিয়ে করব না করব সেটা সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার।

': দাদাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কেমন?

': ভালোই, তবে আমাকে তাঁরা তেমন বুদ্ধিমান ভাবেন না। হাসল, আমি কস্ট অ্যাকাউনটেণ্ট, কমার্সের মাস্টার ডিগ্রি, তাই দোকানের হিসেব-পত্র সব আমার হাতে, কিন্তু এ-ব্যাপারেও তাঁদের সজাগ দৃষ্টি …ভুলটুল হচ্ছে কিনা।

অবন্তী এই থেকেই যেটুকু বোঝার বুঝে নিলো। বলল, আমি আমার নিজের সাধ্যমতো মেয়ের বিয়ে দেবো, কারো কাছ থেকেই কোনোরকম আর্থিক সাহায্য নেবো না…কিন্তু তোমার দাদারা জানবেন মস্ত লোকের মেয়ে, এই নিয়েও তো কথা উঠবে?

—উঠতে পারে, কিন্তু আপনি দাদাদের কথা বড় করে ভাবছেন কেন মা, বিয়ে তো করছি আমি! আমি কেবল চাই, বিয়ের আগে কোনো-রকম অশান্তি না হয়, পরের ভাবনা আমার। বিয়ের পর ভিন্ন কোয়া-র্টারস নিলেও সে-ভাড়া আমার কোম্পানি দেবে।

অবন্তী তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো খানিক। তারপর উঠে বলল, ঠিক

আছে, এবারে আমার বাড়ি চলো।

বিকাশও খুশি মুখে উঠে দাঁড়ালো। অবন্তী স্কুল গেটের বাইরে এসে দেখে একটা ঝকঝকে অ্যামবাসাডার গাড়ি দাঁড়িয়ে। বিকাশ সেদিকে এগিয়ে যেতে ড্রাইভার দরজা খুলে দিলো।

': আসুন। বিকাশ দরজা ধরে দাঁড়ালো।

অবন্তী উঠলো। বিকাশ পাশে বসে দরজা বন্ধ করতে মৃদু গলায় জিগ্যেস করল, এটা কার গাড়ি ?

': কোম্পানির। বেশির ভাগ সময় আমিই ব্যবহার করি। আপনার আশীর্বাদে শীগগিরই নিজের গাড়িও হবে।

এই ছেলেকে প্রাণ ভরেই আশীর্বাদ করতে ইচ্ছে করছে অবন্তীর।

বাড়ির দরজায় নিঃশব্দে গাড়ি থামল। দু'জনে নামতে বিকাশ গাড়ি বিদায় করে দিলো। বাইরের দরজা খোলা। কালু বারান্দায় বসে। তাদের দেখে উঠে দাঁড়ালো। অবন্তী বলল, ইনিই তোমার কাকা। দেওরকে বলল, তুমি অফিসে খবর নিতে গেছলে বলে ওর বস্ ওকে ঠাট্টা করেছে—

বিকাশ হাসিমুখে নত হয়ে তাকে প্রণাম করল। স্কুলে যোগাযোগ হবে কালু জানত, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে দেখেই বুঝল ব্যবস্থা পাকা। সাদরে কাঁধ জড়িয়ে ধরে তাকে বসালো। বলল, আমি মুখ্যুসুখ্যু ফ্যাক্টরীর মানুষ, আমার কি কাণ্ডজ্ঞান আছে ?

আলো ঘরে বসে ভাবছিল শনিবারে মায়ের ফিরতে এত দেরি কেন। কাকার গলা পেয়ে বাইরে এসে অপ্রস্তুত একটু। তারপরেই আগন্তুককে ভালো করে দেখে প্রথমে হতভম্ব।

অবন্তী গম্ভীর মুখে বলল, ছাখ্ তো, চিনিস একে ?

এবারে একটু ঝাঁজালো গলায় আলো জবাব দিলো, চিনি না, একদিন সেধে আলাপ করতে এসেছিল।

কাকাও প্রায় গম্ভীর।—কিন্তু ও যে বলল ওকে তুই খুব চিনিস, তাই

বাড়িতে আলাপ করতে এলো।

এবারে রাগে আলোর অত ফর্সা মুখ টকটকে লাল।—মিথ্যে কথা—চলে যেতে বলো!

': এই মেয়ে! এবারে অবন্তীর গলা!—ও আসে নি, আমিই ওকে ঘরে নিয়ে এসেছি, ও আমার খুব আদরের ছেলে, বসে কথা বল্। বিকাশকে বলল, আমি তোমার জন্য একটু চা করে নিয়ে আসি—

বিকাশ বলল, শুধু চা কিন্তু মা, যা ভর-পেট মিষ্টি খাইয়েছেন!

মা শুনে আলো গোল গোল চোখ করে প্রথমে ওই লোককে দেখতে লাগল। ততক্ষণে অবন্তী ভিতরে।

': বোস্, বসে কথাবার্তা বল্, খবরদার মাথা গরম করবি না! ছু'চোখ বুজে বড় গোছের কিছু ইশারা করে কাকুও ঘরের আড়ালে।

অবন্তী এরপর হঠাৎ বাইরে থেকে পল্লবের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছে, মেয়ের ব্যাপারে কথা আছে, আসতে হবে।

পরের দিনই বেলা এগারোটা নাগাদ এসেছে। বেশি না হোক অল্প-স্বল্প ড্রিঙ্ক করে এসেছে বোঝা যায়। অবন্তী সেটা বুঝে ঝাঁজালো গলায় বলেছে, মন দিয়ে শোনার মতো মাথা নিয়ে এসো, এখন যাও।

আরো রাগ হয়েছে কারণ, সে আসবে বলে অবন্তী স্কুল কামাই করেছে। মস্ত সিঁদুরের দিকে থমকে তাকিয়েছে পল্লব। তারপর হেসেই বলেছে, অল্প খেলে আমার মনোযোগ আরো বাড়ে—কি বলবে বলো।

শুনেই প্রথমে আপত্তি করেছিল। এখনই মেয়ের বিয়ে কি! কিন্তু আপত্তি টিকবে না জানা কথাই। জিগ্যেস করেছে, কত টাকা লাগবে?

': এক পয়সাও না, লোকে পাঁচ কথা বলবে বলেই মেয়ের বাবাকে ডাকা হয়েছে, নইলে দরকার ছিল না।

পল্লব তেতে উঠেছে, আমার মেয়ের বিয়ে তুমি টাকা নেবে না মানে?

': মানে তোমার টাকা আমি এখন আর নিজের টাকা ভাবি না—তাই!
আরো রেগে গিয়ে পল্লব বলেছে, মেয়েকে তো আমারও মেয়ে ভাবো, নাকি তাতে কোনো সন্দেহ আছে ?

': সাবধান হয়ে কথা বলো ! মেয়ে যেদিন তোমাকে সম্মানের বাবা ভাবতে পারবে সেদিন তোমার সব-কিছু নিতে তারও অসুবিধে হবে না—বিয়ের দিনে তোমাকে এসে দাঁড়াতে হবে, এর বেশি দয়া তোমার থেকে কেউ চায় না।

পল্লব মুখ চুন করেই চলে গেছে।

ঝামেলা এড়ানোর জন্য বিকাশ প্রথমে রেজিস্ট্রি বিয়ের কথা বলেছিল। কিন্তু অবন্তী কান পাতে নি। তার মতে অগ্নি-সাক্ষীর বিয়ে ছাড়া বিয়েই নয়।

বাড়ির লোককে জানিয়েই বিকাশ বিয়ের দিন স্থির করতে বলেছে। কিন্তু বিয়ের আগে দাদা বউদিরা মেয়ে একেবারে দেখবেই না, তা-ও হয় না। ঝামেলা আর সংশয় এড়ানোর জন্যই বিকাশ আলোর সঙ্গে তার মা-কাকাকেও নেমন্তন্ন করেছিল। কিন্তু অবন্তী বলেছে, সেটা আরো খারাপ হবে, তুমি কেবল আলোকেই নিয়ে যাও, আজকালকার দিনে তাতে কোনো কথা উঠবে না—তুমি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করছ, দেখাতে নিয়ে যেতে অসুবিধে কি।

তাই করা হয়েছে। ফিরে এসে হাসিমুখে আলো বলেছে, কি মিথ্যুক জানো মা, বাড়িতে বলে রেখেছে আমাদের মস্ত আর একটা ভাড়াটে বাড়ি আছে, কিন্তু শুভ কাজ-কর্ম সব বাস্তু ভিটেতেই হয়, তাই বিয়ে এই ছোট বাড়িতেই হবে।

অবন্তী বলেছে, মিথ্যুক নয়, উল্টে বুদ্ধিমান বলে সম্মান করতে শেখ। জেনেশুনে ও আমাদের সকলের সম্মান বাঁচিয়ে বিয়েটা করতে চাচ্ছে।

চিত্রটা আপাতত এই পর্যন্তই।

ওঠার আগে অবন্তী আমার স্ত্রীকে বিয়ের দিন সকালেই চলে যাবার জন্য বলল। বাপের বাড়ি থেকে দাদা-বউদিরা কেবল নিমন্ত্রিতের মতো আসবে যাবে। পাড়ার এয়োরা ছাড়া আর ওকে সাহায্য করার কেউ নেই। বলতে ভুলে গেছি, বছর দেড়েক আগে ছ'মাসের ব্যবধানে অবন্তীর বাবা-মা ছু'জনেই মারা গেছেন। আর আমাকে বলে গেল, ছেলের বাড়ির লোকজন যখন দেখবে আমার আসল গার্জেন তুমি, তখন অন্য দিকের ঘাটতি অনেক পুষিয়ে যাবে—তুমি বিকেল থেকেই গিয়ে দাঁড়াবে।

আমি হেসে বললাম, আজই একবার গিয়ে দাঁড়াব, চল্ তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি, আর আমার নাতনী যে হিসেব-মাস্টার কস্ট অ্যাকাউনটেন্ট্ ছেলের মুণ্ডু ঘোরালো তাকেও একবার দেখে আসি। তাছাড়া তোর কাকিমা সকালে গেলে ড্রাইভারেরও বাড়িটা চিনে আসা হবে।

অবন্তী খুব খুশি।

আলো নাম সার্থক। ঘর আলো-করা মেয়েই বটে।

কালু এক ফাঁকে চুপিচুপি বলল, আমিই কেবল জানি কাকু, বউদির ভিতরটা দিনে দিনে পাথর হয়ে যাচ্ছিল, মেয়েকে বুঝতে দিতো না—এই ক'দিন ধরে যেন পাথরে প্রাণ এসেছে।

ওর মুখেই শুনলাম, অবন্তী তাকে এ-বিয়ের জন্য প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে পর্যন্ত টাকা তুলতে দেয় নি, বলেছে, জীবনটা তো আমাদের জন্যেই পাত করলে, ভবিষ্যতের জন্য ওই টাকা জমা থাক, পরে তো সবই ওর ভাগ্যে যাবে। বলল, সোনা ছু'হাজার টাকা ভরি এখন, নিজের পঞ্চাশ ভরি সোনা থেকে পঁচিশ ভরি বিক্রি করেছে, বাকি পঁচিশ ভরিতে মেয়ের গয়না আর জামাইয়ের আংটি বোতাম সব হয়েছে। সোনা বিক্রির পঞ্চাশ হাজার আর নিজের জমা হাজার দশেক—এই ষাট হাজার টাকায় বিয়ের অন্যান্য খরচ—গয়না ধরলে এক লক্ষ দশ হাজারে বউদি

আশ মিটিয়ে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে—খাওয়া খরচ তো কিছুই না, বর-যাত্রী নিয়ে একশ' জনও হবে কিনা সন্দেহ।

আমার স্ত্রী বিয়ের দিন সকালেই গেছে, আর খাওয়া-দাওয়ার পর বিকেল সাড়ে তিনটেয় ফিরেছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা ছ'টায় আবার আমার সঙ্গে যাবার কথা।

মুখ দেখেই বুঝলাম কিছু একটা উত্তেজনা নিয়ে ফিরেছে। খবর জিগ্যেস করার আগেই ধপ করে সামনের সোফায় বসে পড়ে বলে উঠল, কি রূপ দেখলাম গো মেয়ের আজ—এখনও আমার গা কাঁটা-কাঁটা দিয়ে উঠছে!

মেয়ের রূপ বলতে ভেবেছিলাম আলোর কথা, কিন্তু গায়ে এখনো কাঁটা কাঁটা দিয়ে উঠছে শুনে সচকিত।—কি ব্যাপার?

—আর বোলো না, আমি ভাবছিলাম একটা রক্তারক্তি কাণ্ডই হয়ে যাবে—আঁশ বঁটি নিয়ে যেন মা-কালী ঠাণ্ডা মুখে ধ্বংসে নামল—

ঘটনা শোনার পর আমিও স্তব্ধ।

···সকাল সাড়ে ন'টার সময় ছেলের বাড়ি থেকে গায়ে হলুদের তত্ত্ব এসেছিল। মস্ত একটা মাছ আর তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক যা থাকে। ছেলের বাড়ির দু'জন কুটুম্ব আর জনা তিনেক কাজের লোক। অবন্তী তাদের খেতে দেবার ব্যবস্থা করছিল। এরই মধ্যে ভিতরের দাওয়ায় একটা চাপা গণ্ডগোল আর থেকে থেকে কার হুমকি

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার ভার কেটারারের হাতে। ভিতরের দাওয়ায় একজন প্রতিবেশিনী অধিবাসের সেই মস্ত মাছটা কুটতে বসেছিল। এরই মধ্যে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছে মেয়ের বাপ পল্লব। সকালেই বদ্ধ মাতাল হয়ে এসেছে। তার পিছনে ঊর্মিমালা। তার কপালে সিঁথিতে টকটকে সিঁদুর।

ভিতরে পা দিয়েই পল্লব জড়ানো গলায় গর্জন করে উঠলো, আমি বোঝা-পড়া করতে এসেছি, কোথায় আলোর মা—ডাকো তাকে! আমার অমতে

যেখানে সেখানে আমার মেয়ের বিয়ে আমি হতে দেবো না—আমাকে অপমান করে এ-ভাবে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে এগোলে আমি রক্ত-গঙ্গা বইয়ে দেবো !

বাইরে কুটুম্ব বসে, কালু জোর করে তাকে পিছনের দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে ।

‘: ছাড়ো ! তীক্ষ্ণ চাপা গলার গর্জনে দাদাকে ছেড়ে কালু ঘুরে দাঁড়ালো ।

অবন্তী পল্লবের দু'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়ালো । জ্বলন্ত চোখে একবার পিছনের রমণী অর্থাৎ ঊর্মিমালাকে দেখে নিলো । তারপর আরো চাপা হিসহিস গলায় পল্লবকে বললো, বাইরের বারান্দায় ছেলের বাড়ির লোক বসে আছে, আর একটি জোরে কথা নয় !

আশ্চর্য পল্লবের এত নেশা এটুকুতেই কেটে যাবার দাখিল, তবু কি বলতে চেষ্টা করার আগেই অবন্তীর আবার অগুন গলানো ঝাপটা ।
—চুপ !

ঊর্মিমালার দিকে ফিরল, খুব ঠাণ্ডা অথচ হিসহিস গলায় বলল, তুমি এখানে কেন ? বেরিয়ে যাও !

সমান তেজে ঊর্মিমালা বলল, বাপকে অপমান করে আপনি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, সেই জন্যে উনি ফয়েসলা করতে এসেছেন, আমি তাঁর চিন্তায় এসেছি—নেমন্তন্ন খেতে আসিনি !

পল্লব আবার তেতে উঠলো, গলা চড়িয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, তুমি ওকে যেতে বলার কে—ও আমার স্ত্রী—কালীঘাটে মন্ত্র পড়ে আমাদের বিয়ে হয়েছে—

অবন্তী ঊর্মিমালার দিকে চেয়ে আছে।—ঘটা করে কপালে সিঁথিতে সিঁদুর দিলেই স্ত্রী হওয়া যায় না—তুমি আমার এই উঠোন অশুচি করেছ—চলে যাও !

পল্লব বলে উঠলো, খবরদার তুমি ওকে অপমান করবে না—

অবন্তী ফিরেও তাকালো না। উর্মিমালার দিকেই চেয়ে আছে। হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা। গলার স্বর আরো ঠাণ্ডা।—তুমি যাবে না?

পিছন থেকে পল্লব বলল, কখনো যাবে না—

অবন্তী ফিরল। যে মহিলা মাছ কাটছিল তাকে ঠেলে সরিয়ে মস্ত বঁটিটা হাতে তুলে নিয়ে পলকে উর্মিমালার দিকে এগোলো।

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উর্মিমালা ছিটকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অবন্তী বঁটি হাতে ঘুরে দাঁড়ালো। পল্লবের নেশা মাথায় উঠেছে। পালাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু অবন্তী তার যাবার পথ আগলে দাঁড়িয়ে। তেমনি ঠাণ্ডা গলা।—বিকেলে কখন আসছ?

': ক-কখন আসতে হবে?

': বিকেল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার মধ্যে।

অবন্তীর হাত থেকে কে একজন বঁটিটা টেনে নিলো খেয়াল করল না। সে পল্লবের দিকেই অপলক চেয়ে আছে।—একলা আসছ···আর খুব সভ্যভব্য হয়ে···মনে থাকবে?

': হ্যাঁ হ্যাঁ থাকবে—সরো।

অবন্তী সরে দাঁড়ালো। পল্লব টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।

বিকেলে এসে অবন্তীকে অনেকবার লক্ষ্য করেছি। একেবারে স্বাভাবিক, ব্যস্তসমস্ত। সকালে এত বড় একটা ব্যাপার ঘটে গেছে মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই।

বাড়ির ভিতরের উঠোনে বিয়ে, বাড়িতেই বাসর ঘর। বাইরের ছোট মাঠটায় প্যাণ্ডেল সাজানো হয়েছে। সেখানেই বসা আর খাওয়া-দাওয়ার জায়গা।

যথাসময়ে আমন্ত্রিত জনেরা এসেছে। বর-বরযাত্রীরা এসেছে। বরযাত্রীরা

বেশির ভাগ মেয়ের বাপ পল্লব দত্তর সঙ্গে কথা বলতে আর তার কথা শুনতে ব্যস্ত। এতবড় একজন শিল্পী, কে না তার সঙ্গে একটু খাতির করতে চায়। লক্ষ্য করছি, সে হাসিমুখেই সকলের সঙ্গে কথা বলছে, আপ্যায়ন করছে। সকালের ঘটনার কোনো দাগ কোনো অভিব্যক্তি তার মুখেও নেই। আমার সঙ্গেও দু'একবার হেসে কথা বলেছে। আসা মাত্র নিজে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে আপ্যায়ন করেছে, আসুন—বিয়ের আসল কর্মকর্তা তো আপনি।

বিয়ে হয়ে গেছে।

...আর তিন মাসের মধ্যে মেয়ে জামাইকে লেখা অবন্তীর ওই চিঠি। আর তার পরদিনই ওই অ্যাকসিডেণ্ট। অসতর্কতায় স্টোভের আগুনে সর্বাঙ্গ ঝলসে গেছে। কেউ কোনোরকম আর্তনাদ শোনে নি, যন্ত্রণার ছটফটানি দেখে নি।

কাগজে ওই অঘটনের খবর পড়ে আমি হাসপাতালে ছুটে গেছি।

তিন দিন বাদে কাগজে তার মৃত্যুর খবর। পল্লব দত্তর শোকের মুখের ছবি। অন্যান্য শিল্পীদের সমাবেশ। তাদের সান্ত্বনা, সহানুভূতি।

...দু'মাস বাদে নাট্য-মঞ্চের পত্র-পত্রিকায় নাট্যোর্বশী উর্মিমালার সঙ্গে পল্লব দত্তর আনুষ্ঠানিক বিয়ের ছবি। আরো কিছু যুগল ছবি।

...ছ'মাস বাদে সমস্ত কাগজে আবার চমক লাগানো খবর। নাট্যোর্বশী উর্মিমালা হত্যার খবর। হত্যাকারী তার স্বামী পল্লব দত্ত।

কোর্টের বিচার। বিচারে মৃত্যুদণ্ড। হাইকোর্টের চূড়ান্ত বিবেচনার অপেক্ষা।

তার মধ্যে পল্লব দত্তরই ইচ্ছেয় জেলে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার।

৭

জেলখানায় বসে গোঁপ দাড়িতে ছাওয়া সুন্দর মুখে হাসি টেনে পল্লব দত্ত আমাকে বলেছিল, একটা ভারী মজার কথা বলে যাবার জন্যেই আপনাকে বারবার করে মনে পড়েছে। সে কথাটা আমি এ পর্যন্ত কাউকেই বলি নি, আপনাকে বলার ইচ্ছে।···আপনি ইচ্ছে করলে কলম ধরে এই কৌতুকের ব্যাপারটা দেশের মানুষকে জানিয়ে দিতে পারেন।

তার নাতি-দীর্ঘ বিস্তার শোনার পর আমারও মনে হয়েছিল এ এক নিখাদ শিল্পীর হৃদয়েরই মজার অনুভব, আর শিল্পীর চোখেরই কৌতুকের ব্যাপার বটে। পল্লব দত্ত বলেছিল, এমন হাস্যকর একটা ব্যাপার একমাত্র তার ছাড়া আর কারো চোখেই পড়ল না, কেউ ভাবতেও চেষ্টা করল না। সব শোনার পর স্বীকার করছি, আমারও চোখে পড়ে নি, আমিও ভাবতে চেষ্টা করি নি।

কিন্তু এটুকু একেবারে শেষের প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গে পৌঁছনোর জন্য পল্লব দত্তর কৈফিয়ত নয়, তার জবানবন্দিটুকু পাঠকের জানা প্রয়োজন।

'···আমি সত্য একটা অমানুষ ছিলাম, বুঝলেন? অভিনয় করতাম, পাড়ায় মদ খেয়ে হৈ-হল্লা করে বেড়াতাম, অভিনয় দেখে হোক বা চেহারা দেখে হোক—অনেক মেয়ে সেধে আমার সংশ্রবে এসেছে—লোকে জানত সুপুরুষ মানুষের চেহারায় আমি একটা শয়তান—আমিও নিজেও তাই জানতাম।·· আশ্চর্য, এই আমার মধ্যে অবন্তী একটা মানুষের হদিস পেল আর তার চোখ দিয়ে দেখে নিজেরও মনে হতে লাগল, এই অমানুষের মধ্যে কোথাও একটা মানুষ লুকিয়ে আছে!'

এই ভাবেই বলা শুরু করেছিল পল্লব দত্ত। তার বলার মধ্যে কোনো

রকম উচ্ছ্বাস ছিল না। সাতচল্লিশ বছরের জীবনে মোট আট সাড়ে আটটা বছর পল্লব বাঁচার মতো বেঁচেছে, বাঁচার স্বাদ জেনেছে। বিয়ের আগের দুটো বছর, যখন অবন্তী তার জীবনে আসবেই বুঝতে পেরেছিল, আর বিয়ের পরের ছ-সাড়ে ছটা বছর। তার আগে বেঁচেছিল জানোয়া-রের মতো, আর পরে বেঁচেছিল মানুষ-জানোয়ারের মতো। মানুষ-জানো-য়ার—জানোয়ারের থেকেও ঢের বেশি অধম।

···ছেলে-বেলায় রূপকথার গল্পে পড়েছে মায়াবী রাক্ষসী অপূর্ব রূপসী মেয়ের রূপ ধরে এসে রাজরানী হতো, তারপর সুযোগ বুঝে রাজার সব কিছু গ্রাস করত। আক্ষরিক অর্থে না হোক চরিত্রগতভাবে পল্লব দত্ত এখন এমন নিষ্ঠুর মায়াবী রমণীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। ঊর্মিমালা প্রথম যখন নিজের ভগ্নিপতির সঙ্গে আশ্রয়ের আশায় তার কাছে এসেছিল, তখন তার সুন্দর মুখে এমন একটা অব্যক্ত সরল আকৃতি ছিল, যেন পল্লব দত্তর একটু করুণার উপর তার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। পল্লবও তখন তাকে কেবল করুণাই করতে চেয়েছে, রমণীর রূপের লোভ এতটুকু ছায়াপাত করে নি। বিধাতার দান এই রূপ যদি শিল্পী হয়ে সার্থক হয় সেটা পল্লবেরও কম কৃতিত্ব নয়। অবন্তী আপত্তি করে নি, কিন্তু পরে পল্লবের মনে হয়েছে কোথাও যেন একটু ব্যতিক্রম ঘটেছে। অনুভব করা মাত্র সে অবন্তীকে বলেছিল, তোমার মনে যদি কোনো দ্বিধা থাকে তো বলো ঊর্মিমালার সঙ্গে অন্য কোনো গ্রুপের যোগাযোগ করে দিই, মেয়েটা বেশ চালাক চতুর, কালে-দিনে ভালো অভিনেত্রী হবে—এমন রূপের মেয়ে পেলে অনেকে আগ্রহ করে নিয়ে নেবে।

অবন্তী জিগ্যেস করেছে, নেবার পরে হঠাৎ এ-কথা কেন?

পল্লব খোলা মনেই জবাব দিয়েছে, তোমার মনে কোনোরকম অবিশ্বাস বা সেরকম কিছুর ছায়া পড়ছে কিনা বুঝতে পারছি না।

অবন্তী বলেছিল, অবিশ্বাস তোমাকে? তারপর হেসে উঠেছিল, তুমি

নরকে গেলেও শেষ পর্যন্ত আমি ছাড়া তোমার গতি আছে? নিজেকে তুমি কতটুকু চেনো? ব্যবসার মুখ চেয়ে তুমি মেয়েটাকে নিয়েছ, আমার অত ব্যবসা বুদ্ধি নেই এটা ঠিক কথা—কিন্তু তুমি ভালো বুঝে নিয়েছ। এখন সরাবে কেন? ভয় নেই, আমার বিশ্বাসের জোর তুমি হাজার চেষ্টা করলেও ভাঙতে পারবে না।

কিন্তু ছ'মাস বাদে উর্মিমালার সঙ্গে স্টেজে অভিনয় করার সময় পল্লব অনুভব করেছে সে এক দুরন্ত দুঃসাহসিনী মায়াবিনীর পাল্লায় পড়তে যাচ্ছে। পড়ে যাচ্ছেও। স্টেজে হাজার হাজার দর্শকের চোখের ওপর অভিনয়ের আবেগে কি অদ্ভুত চাতুরীতে তার তপ্ত যৌবনের স্পর্শ এমন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত যে পল্লবের কান মাথা গরম হয়ে যেত। বাইরে অভিনয় করতে গেলে এরকম আরো বেশি হতো। পল্লব অনেক সময় ধমকের সুরে বলত, এতটা করতে যাও কেন, যেটুকু দরকার সেটুকুই করবে। জবাবে ভ্যাবাচাকা খাওয়া সরল সুন্দর মুখ।—ও তো অভিনয়·· তখন কতটা কি করে ফেলি আমার খেয়ালও থাকে না।

ওই রমণী-দেহ ঘিরে পুরুষের লোভ উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে? উর্মিমালার তা জানতে বুঝতে বাকি ছিল না। একা যখন, বিবেকের চাবুক তুলে পল্লব নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে পিটত। উর্মিমালা তা-ও বুঝতে পারত। একদিন বলেছিল, আমার চোখে আপনি হিমালয়ের মতো উঁচু মানুষ, আপনার শান্তির ব্যাঘাত হচ্ছে মনে হলে আমাকে দূর করে তাড়িয়ে দিন। বলতে বলতে ঝর-ঝর করে কেঁদেও ফেলেছিল।

···তখন থেকে পল্লবের মদ খাওয়া বাড়ছিল। অবন্তীর সামনে সহজ স্বাভাবিক থাকা কঠিন হয়ে উঠছিল। অবন্তীর মুখের দিকে চেয়ে তার ভেতর দেখতে পেত। দেখত। কিন্তু কিছু বলত না।

বাইরে অভিনয় করতে গেলে তার ওপর উর্মিমালার আধিপত্য বেড়েই চললো। শিল্পী-গুরুর খাওয়া-দওয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুবিধে অসুবিধে নিয়ে

অভিনয়ের থেকেও তার বেশি চিন্তা। যেখানেই যাক, পল্লব দত্তর পাশের ঘরে তার থাকার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা নিজেই করে নিত। ইউনিটের লোকেরাও তখন অন্যরকম বুঝতে শুরু করেছিল।

···অভিনয়ের পর স্নান-টান সেরে শিথিল বেশবাসে পল্লব দত্তর ঘরে আসত। বারণ করলেও শুনত না। নিজেও যত ক্লান্তই হোক, গুরু-সেবার কর্তব্য থেকে তাকে নিরস্ত করা যেত না। নিজের হাতে মদের গেলাস আর নানা রকম খাবার সাজিয়ে দিত। না, তখন নিজে মদ স্পর্শও করত না, পরপর তাকেই ঢেলে দিয়ে যেত। শ্রান্তিতে হাই তুলত, বুকের আঁচল খসে পড়ত, খেয়াল হলে আরক্তিম লজ্জায় আঁচল আবার তুলেও দিত। লোভ চাপা দেবার তাগিদে পল্লব আকণ্ঠ মদ খেত।

···ঊর্মিমালা আসার দু'বছরের মাথায় পল্লব দত্তর অনিবার্য পতন শুরু হয়েছে। অবন্তীকে কেউ কিছু বলেনি, ইউনিটের কেউ নালিশও করে নি। যা বোঝার নিজে থেকেই বুঝেছে। তারপর একদিন মেয়ে নিয়ে বেহালার বাড়িতে সরে গেছে। অনুতাপের নিষ্ফল আগুন পল্লবের মাথায় তখন ক্রোধ হয়ে জ্বলেছে। অবন্তী ইচ্ছে করলে তাকে জাহান্নমের পথ থেকে ফেরাতে পারত, ফেরায় নি। মেয়ের দাবীতে সে নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে চেয়েছে কিন্তু ঠাণ্ডা মুখে অবন্তী বলেছে, মেয়েকে তার বাপের চোখের সামনে থেকে সরানোর দায়েই যাচ্ছি—তোমাকে যা বলেছি তার মধ্যে মিথ্যে নেই—তুমি নরকে গেলেও শেষ পর্যন্ত আমি ছাড়া তোমার গতি নেই জেনে রেখো।

ঊর্মিমালা বোকা নয়। পল্লব দত্তর তখনকার মনের অবস্থা সে বেশ ভালো-ভাবেই বুঝেছিল। কিন্তু পুরুষকে একবার হাতের মুঠোয় পেলে তাকে বশ করার কত রকমের স্থূল কলা-কৌশলই জানত সে। পুরুষকে সে অনায়া-সে ভোগের দরিয়ায় টেনে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে ভাসিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে পারে। পল্লব দত্ত তখন থেকেই বুঝেছে এই মেয়ের বিয়ের আগের

জীবন আর পরের বিবাহিত জীবন কত বিষাক্ত হতে পারে। তার স্বামী পাগল হয়ে পরে আত্মহত্যা করে ভব-যন্ত্রণা দূর করেছে।

পল্লব দত্ত কি করবে? হয় মদ নয়তো ভোগের পঙ্কিল সমুদ্রে ডুবে গিয়ে নিজের অস্তিত্ব ভুলে থাকা ছাড়া তার আর গতি নেই।

একটু একটু করে অবন্তিকার সমস্ত কর্তৃত্ব উর্মিমালা নিজের মুঠোয় এনেছে। তবু এত নিষ্ঠুর যে অবন্তীকে একেবারে নিঃশেষ করতে না পারা পর্যন্ত তার শান্তি নেই। সে-ই যেন তার জীবনের চরম শত্রু। মেয়েকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনার জন্য কতভাবে ফুসলেছে, কত অভিনয় করেছে, কিন্তু পল্লব দত্ত সেটা পেরে ওঠে নি বলে তার দ্বিগুণ ক্রোধ। উর্মিমালা ততদিনে নিজেও মদ ধরেছে। কিন্তু পল্লবের বিশ্বাস তার মদের সঙ্গে সে এমন কিছু মেশাতো যার ফলে তার পুরুষকার ক্রমে বিলুপ্তির দিকে নেমে চলেছে। সে তার ইচ্ছেমতোই তাকে চালাতে চেষ্টা করত, চালাতোও। সহজে না পারলে নেশায় আর কুৎসিত সম্ভোগের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তারপর তাকে তাতিয়ে তুলত। অনেক সময়েই তখন আর কাণ্ডজ্ঞান থাকত না পল্লব দত্তর। উর্মিমালার প্ররোচনাতেই পৈতৃক বাড়ির অর্ধেক দাবি জানিয়ে ভাইকে অ্যাটর্নির চিঠি দিতে বাধ্য হয়েছিল সে। কিন্তু অবন্তীকে জব্দ করার সেই প্ল্যান ভেস্তে গেল বলে উর্মিমালার অত সুন্দর মুখখানা কি বীভৎস আর পৈশাচিক হয়ে উঠেছিল সে কেবল পল্লবই জানে। উর্মিমালা সেই দিনই খুব ভালো করে বুঝেছিল, রূপে আর ছলাকলায় ভুলিয়ে সে তাকে ভোগের রসাতলে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছে, কিন্তু পল্লব দত্তের বুকের অনেকটা জায়গাই অবন্তী আর মেয়ে জুড়ে বসে আছে। গল্‌ফ ক্লাবের বাড়ি ছেড়ে উর্মিমালা আরো আরামের আরো বিলাসের একটা গোটা বাড়ি নিয়ে বাস করছে পল্লবের সঙ্গে, কিন্তু বেহালায় ওই ছোট্ট বাড়ির অংশ আলোর নামে লেখাপড়া করে দেবার ফলে তার বুক জ্বলে গেছে।

…অবন্তীকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার শেষ আর চরম চেষ্টা উর্মিমালা করেছিল আলোর বিয়ের সময়। পল্লব দত্তর আজও কৌতূহল তার মদের সঙ্গে উর্মিমালা এমন কি মেশাতো যে সাময়িকভাবে মানে কিছুদিনের জন্য সে নিজস্ব বিচার বুদ্ধি বিবেচনা একেবারে খুইয়ে বসত। এক বারে দু বারে না হোক, দশ বার করে একই মন্ত্র কানে দিতে দিতে পল্লব শেষ পর্যন্ত তা বিশ্বাস করত, উত্তেজিত হতো। যেমন শেষ পর্যন্ত সে বিশ্বাস করেছিল, তাকে জব্দ করার জন্য আর আক্কেল দেবার জন্যই অবন্তী একটা বাজে ছেলের সঙ্গে এইটুকু মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। সক্কলে জানবে কত বড় এক শিল্পীর মেয়ের কি দীন দরিদ্রভাবেই না বিয়ে হচ্ছে। স্বামী যে কত বড় অপদার্থ সকলের চোখে এটা প্রমাণ করার জন্যই এই বিয়ে। উর্মিমালা কেঁদে বলেছে, আমি যেমনই হই একটা কচি মেয়ের সর্বনাশ হতে দেবো না, আমার কথা শুনলে ঢের আগেই ওই মা-কে ডিভোর্স করে মেয়েটাকে তুমি আমার কাছে এনে দিতে—তোমার পায়ে পড়ছি এখনো তুমি এই বিয়ে বন্ধ করো, ঈশ্বরের দিব্বি কাটছি ওই মেয়ের আমি এমন বিয়ে দেবো যে চিরকাল সে রাজরানীর মতো থাকবে।

…আশ্চর্য, মদে আর ওষুধে পল্লব দত্তর বিকল স্নায়ু সত্যি তেতে উঠেছে। মাথায় আগুন জ্বলেছে। এর দিন দশ-বারো আগে মত্ত অবস্থায় তাকে এক রাতে উর্মিমালা কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে দু'জনের একটা বিয়ের অনুষ্ঠান সেরেছে। টাকায় কি না হয়, উর্মিমালা আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল। একান্ত নিরিবিলিতে পুরোহিত কিছু মন্ত্র পড়ে মালা বদল করিয়ে আর তার হাত দিয়ে উর্মিমালার কপালে সিঁথিতে মায়ের পায়ের সিঁদুর পরিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছে। ফেরার সময় বলেছে, আর কিছু নয়, আলোর মতো মেয়ের মা হতে হলে এটুকুর দরকার। অবন্তী মারা যাবার দু'মাস পরে কাগজে যে তাদের বিয়ের খবর

আর ছবি ছাপা হয়েছিল সেটা ভাঁওতা। কাগজের লোকদের এই উপলক্ষে পার্টি দিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে এনে উর্মিমালা শুধু এই প্রচারটুকু পাকা করেছিল।

...যাক, কালীঘাটের সেই বিয়ের পরে 'অনিবার্য করেণে' বলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দশ দিনের জন্য অবন্তিকার শো বন্ধ করে উর্মিমালা তাকে নিয়ে পুরীতে হনিমুনে গেছল। উদ্দেশ্য, কদর্য ভোগের অতলে টেনে নিয়ে গিয়ে দিবা-রাত্রি কানে মন্ত্রণা দিয়ে তাকে প্রস্তুত করা। ফিরেছে যখন আলোর বিয়ের আর পাঁচ দিন মাত্র বাকি। কিন্তু ফেরার পর পল্লব আবার চুপসে গেছে, অবন্তীর মুখখানা যতবার চোখের সামনে এসেছে, তাতে তার সঙ্কল্পে ফাটল ধরেছে। উর্মিমালা কান্নাকাটি করেছে, কখনো বা হিংস্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

এই করে আলোর বিয়ের আগের রাত্রে পল্লব দত্তর চূড়ান্ত অধঃপতন। সে তখন নেশায় চুর। সেই অবস্থায়ও ভোগের কুৎসিত আচরণে উর্মিমালা তাকে উন্মাদ করে তুলতে পেরেছিল। মা-কালীর দিব্বি কেটে পল্লব প্রতিজ্ঞা করেছে, রাত পোহালে বিয়ের দিনই সে এই বিয়ে বরবাদ করে দেবে। পাছে সঙ্কল্প টলে যায় এ জন্য উর্মিমালা সকালেও জোর করেই তাকে মদ খাইয়েছে। আর কিছু না হোক, সকালে এমন মত্ত অবস্থায় লোকটাকে ছেলের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারলে সকলে হতচকিত হবে। আর, এমন একটা ভালো ছেলে কার মেয়ে কেমন মায়ের মেয়েকে ঘরে আনতে চলেছে এটা উর্মিমালাই বুঝিয়ে দিয়ে আসতে পারবে। এখনো এই বিয়ে বন্ধ করতে হলে এই একটাই পথ।

কিন্তু গাড়িতে উঠেই মদের নেশায় পল্লব দত্তর মাথায় অন্য খেয়াল চাপল। ছেলের বাড়িতে নয়, আগে বেহালার বাড়িতে যাবে—সে কি কাপুরুষ যে চুপিচুপি বিয়ে ভাঙবে? আগে অবন্তীকে শাসিয়ে আর জানান দিয়ে তারপর ছেলের বাড়িতে যাবে। উর্মিমালা প্রমাদ গুনেছে,

বারবার করে বুঝিয়েছে আগে তাদের ছেলের বাড়িতেই যাওয়া উচিত। কিন্তু পল্লব দত্তর তখন সিংহের মেজাজ। বাধা দিতে উর্মিমালার ওপরেও মারমুখী। ড্রাইভারকে গালাগাল দিয়ে আগে বেহালার বাড়ি যেতে হুকুম করেছে।

এর পরের প্রহসন পাঠকের জানা।

এভাবে অপদস্থ হবার পর উর্মিমালা হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা। পল্লব দত্তর মনে হয়েছে, আর অবন্তী নয়, এবারে উর্মিমালার প্রতিশোধের অস্ত্র তার ওপরেই নেমে আসবে। আসুক। এ জন্য সে বিচলিত নয়। এ দণ্ড তার প্রাপ্য।

...মদ খেয়ে মাঝে মাঝে স্টেজেও বেতালা হয়ে যাচ্ছিল বলে মাস কতক আগেই অন্য গ্রুপ থেকে একজন বেশ স্মার্ট আর্টিস্টকে ভাঙিয়ে নিয়ে এসেছিল। নাম মলয় গুপ্ত। বয়সে উর্মিমালার থেকে বছর দুই ছোট। আধা-ফর্সা মিষ্টি চেহারা। তাকে খুব একটা তালিম দেওয়ার দরকার ছিল না, কিন্তু অবন্তিকার সমস্ত দায়িত্বভার যার হাতে, অর্থাৎ উর্মিমালা নিশ্চিন্ত থাকে কি করে? রাগ নয়, পল্লব দত্তর হাসিই পেয়েছিল। এমনি মনোভাব নিয়ে সে-ও একদিন উর্মিমালাকে অবন্তিকায় টেনে এনেছিল। ...তারপর অবন্তী অর্থাৎ মঞ্চের 'বিদিশা' সরেছে, উর্মিমালা প্রধান হয়েছে। একই লক্ষ্য নিয়ে সে-ও এক মলয় গুপ্তকে তৈরি করছে। ভালো-মন্দ—পল্লব দত্ত সবই এখন ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। তবে, উর্মি-মালা বোকার মতো কিছু করে নি। পল্লব ক্বচিৎ কখনো অপারক হয়ে পড়লে মলয় গুপ্ত তার জায়গায় আসত। তা না হলে তার স্থান দ্বিতীয় পুরুষ ভূমিকায়।

হয়তো এ-ভাবে খুব বেশিদিন চলত না, উর্মিমালা আগেই মুখোশ খুলে ফেলত।...যদি না আলোর বিয়ের তিন মাসের মধ্যে অবন্তী আত্মহত্যা করে বসত।

এ-জায়গায় আমি বাধা দিয়েছিলাম।—আত্মহত্যা তুমি জানলে কি করে, সবাই তো জানে দুর্ঘটনা, মৃত্যুর আগে অবন্তীও সে-কথাই বলে গেছে।

—আমি জানি আত্মহত্যা। এর পাঁচ ছ'দিন আগে অবন্তী আমাকে এই ধাক্কা দেবার কথাই চিঠিতে লিখেছিল—কিন্তু ধাক্কার অর্থটা তখন আমি বুঝতে পারি নি।

আমি অবাক।—অবন্তী তোমাকে কি লিখেছিল?

যা লিখেছিল গড়গড় করে বলে গেল।

'...তোমাকে নিয়ে আজ মেয়ে জামাইয়ের মনেও শান্তি নেই। আলোকে তার ভাসুর আর জায়েদের অনেক কথাই শুনতে হচ্ছে। আমি নাকি অনেক কিছু গোপন করে ফাঁদ পেতে অমন একটা ভালো ছেলে ধরেছি। বিকাশের কথা তার দাদা বউদিরা কেউ বিশ্বাস করছে না। কিন্তু সেটা অসহ্য ব্যাপার কিছু না। সব থেকে অসহ্য ব্যাপার তোমাকে আর ঊর্মিমালাকে নিয়ে নানা-রকম মুখরোচক আলোচনা। তোমার চরিত্রই আলোর জীবনে সব থেকে বড় কলঙ্ক হয়ে উঠছে। যাক, আমার বিশ্বাস ছিল, নরকে ডুবলেও শেষ পর্যন্ত তোমাকে ফিরতে হবে, আমি ছাড়া তোমার গতি নেই। জেনে রাখো সেই বিশ্বাস আমার আজও টলে নি। তোমাকে ফিরতে হবে। হবেই। কিন্তু এখন তুমি নরকের এত গভীরে ডুবে আছ যে সে রকম ধাক্কা না খেলে তোমাকে টেনে তোলা যাবে না। তাই এমনি একটা বড় ধাক্কার জন্যেই প্রস্তুত থেকো—অবন্তী।'

—তারপর? আমি উদ্‌গ্রীব।

ঊর্মিমালা এসে টেবিলের ওপর চিঠিটা দেখল। আমার মুখের দিকে চেয়েই বুঝল কিছু হয়েছে। চিঠি ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে পড়ল। তারপর ঝলসে উঠলো।—ধাক্কা দেবেন মানে উনি তাহলে কেস করতে যাচ্ছেন! মস্ত ধাক্কা দিয়ে তোমাকে নরক থেকে তুলবেন! তার আদরের দেওর কেস করার জন্য তাকে কত টাকা যোগাবে? কতটুকু মুরদ তার? রাগের

চোটে চিঠিটা সে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেললো।

ছিঁড়লেও চিঠিটা এতবার পড়া হয়ে গেছে যে পল্লব দত্তর প্রতিটি অক্ষর মনে আছে। ধাক্কার অর্থ যে কেস-এ নামা এটা তার একবারও মনে হয় নি। উর্মিমালা বলার পরেও মনে হলো না। এক অজ্ঞাত অস্বস্তিতে ভিতরটা ছেয়ে গেল। একটা অহেতুক ভয়ও থেকে থেকে পেয়ে বসল। কিন্তু ঠিক এই সময়ই দিনকতকের জন্য তাদের বাঁকুড়ায় প্রোগ্রাম। চলে গেল। ভাবল এর মধ্যে ভালো করে ভাববে। ফিরে এসে না হয় চুপচাপ অবন্তীর সঙ্গে দেখা করবে।

···তা আর হলো না। অবন্তীর দুর্ঘটনার খবর কাল কলকাতার 'অবস্তিক' অফিসে জানিয়েছে। সেখান থেকে ফোনে বাঁকুড়ায় খবর এসেছে।··· সকলের চোখ এড়িয়ে এরপর পল্লব দত্ত কেবল নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে, কেন চিঠিটা পাওয়া মাত্র বড় ধাক্কাটা কি সে বুঝতে পারল না। অবন্তীর ধাক্কা যে এরকমই হবে সে তো একমাত্র তারই বোঝার কথা।

এরপর পল্লব দত্ত একেবারেই হল ছাড়ল। দিন-রাত কেবল মদে ডুবে থাকে। উর্মিমালার কোনো কাজেই আর বাধা দেয় না। দু'মাসের মধ্যে সে বিয়ে ঘোষণা করে খবরের কাগজের লোক ডেকে মস্ত পার্টি দিলো। পল্লব দত্ত তো জাত-অভিনেতা, হাসিমুখে তখনো সে ফোটোগ্রাফারদের ক্যামেরায় উর্মিমালার সঙ্গে ধরা দিতে পেরেছে। এরকম একটা অনুষ্ঠান ভবিষ্যতের জন্যও উর্মিমালার দরকার। তার অস্তিত্ব এই পৃথিবীতে আর বেশিদিনের জন্য নয় সেটা আর কেউ না জানুক উর্মিমালা অন্তত জানত। মদের সঙ্গে ওষুধ চালিয়ে আধমরা করেই এনেছে। হয় পল্লব দত্ত নিজেই পৃথিবী থেকে সরবে, না হয় ধীরে সুস্থে একেবারে সরানোর ব্যবস্থা সে-ই করবে। কারণ ততদিনে মলয় গুপ্ত উর্মিমালার মনের মানুষ হয়ে উঠেছে সেটা পল্লব দত্তর জানতে বুঝতে বাকি নেই। কিন্তু সর্বাধিনায়িকা হলেও অবস্তিকা প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আর শতকরা

ষাট ভাগের মালিক এখনো পল্লব দত্ত। বিয়ে না করলে ভবিষ্যতে সব তার অধিকারে আসবে কি করে?

···সব জেনে বুঝেও পল্লব দত্ত নির্লিপ্ত। একটু একটু করে অভিনয় করাই ছাড়ল। তার জায়গায় জাঁকিয়ে বসতে লাগল মলয় গুপ্ত। মঞ্চের আড়ালে তাদের ভোগের বাস্তব অভিনয় অনুমানসাপেক্ষ। স্মার্ট মিষ্টি চেহারার ছেলেটা উর্মিমালার থেকে কম করে তু'বছরের ছোট।···তাতে কি? দেহে কি বয়েস খোদাই করা থাকে। মেয়েদের তো রূপই বয়েস।

মদ গিলে দিন-রাতের বেশির ভাগ সময়েই পল্লব দত্ত নিজের স্নায়ু ভোঁতা করে রাখে। মাঝে মাঝেই তু'পাঁচ দিনের জন্য কলকাতার বাইরে এদিক-সেদিক চলে যায়। তখন আর উর্মিমালার তার সঙ্গে যাবার কোনো আগ্রহ নেই। বরং লোক না থাকলেই খুশি। পল্লব দত্ত বাইরে গেলে আর শো না থাকলে সন্ধ্যার পর মলয়বাবু এসে কত রাত পর্যন্ত থাকেন সেটা আর পুরোনো চাকর প্রহ্লাদ বলবে কি করে? তার তো রাত ন'টাতেই ছুটি হয়ে যায়, কখনো বা উদার হয়ে কর্ত্রী তাকে আগেই ছুটি দিয়ে দেন। অর্থাৎ তাদের সন্ধ্যার আড্ডা ওর রাতের ছুটি হয়ে যাবার পর পর্যন্তও গড়ায়ই। আর, পল্লব দত্ত বাড়ি থাকলে অনেক রাত পর্যন্ত মদ গেলে বলে ইদানীং শোবার ঘরে আর তার শোয়াই হয় না—যে ঘরে বসে মদ খায় সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ে।

···ছ'টা মাস এইভাবেই কেটেছে।

লম্বা প্রোগাম নিয়ে তু'দিন বাদে অবন্তিকা গ্রুপ যাবে উত্তর বাংলায়, তু'দিন আগে পল্লব দত্ত চলল পুরীতে। এ-রকম যাওয়া নতুন কিছু নয়। বাড়ির গাড়ির ড্রাইভার তাকে স্টেশনে পৌঁছে দিলো, আর মদের পেটিসহ প্রহ্লাদ তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ঘরে ফিরল।

কিন্তু একঘণ্টার মধ্যেই ট্রেন থেকে নেমে আবার কলকাতা ফিরবে এ কি পল্লব দত্ত নিজেই জানত! মাথার মধ্যে তার হঠাৎ কি হয়ে গেল কে

জানে। আগুন জ্বলতে থাকল। ভাবল এ-ভাবে সে একটা জন্তুর মতো আর দিন কাটাবে কেন? অবন্তী কি লিখে গেছল? কি আশা নিয়ে সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে? আগে তেরোটা বছর ধরে তিলে তিলে পলে পলে জ্বলেছে, তারপর দেহ জ্বলেছে। লিখে গেছে সে ফিরবে, এই বিশ্বাস তার আজও টলে নি। লিখেছে, তোমাকেই ফিরতে হবে। হবেই। লিখেছে, তুমি নরকের এত গভীরে ডুবে আছ যে সে-রকম ধাক্কা না খেলে তোমাকে টেনে তোলা যাবে না।···সে রকম ধাক্কাই তো অবন্তী দিয়ে গেছে। তবু এখনো সে ফিরছে না কেন?

অবন্তী! আমি কোথায় কার কাছে ফিরব?

ওরে আলো, তোর মা এ কি বলে গেল আমাকে, ফিরে এলে তুই কি আর আমাকে নিবি?

নিবি নিবি নিবি?

নেমে এলো। কলকাতায় ফিরল। কিন্তু কি ভেবে সেদিন আর বাড়িতে এলো না। একটা হোটেলে উঠলো। অনেক রাত বাদে সেই রাতে আর মদ খেল না। ফলে সমস্ত রাত ঘুমও হলো না। পরদিন সকালে তার অ্যাটর্নির কাছে গেল। যাবতীয় ব্যাপারে পরামর্শ করল। আগে ঘরের জঞ্জাল সাফ করার পরে, পরের চিন্তা। আজই করবে, ঐ নাট্যোর্বশীকে লাথি মেরে আগে বাড়ি থেকে তাড়াবে, তারপর অবন্তিকাকে যোগ্য কর্মচারীদের হাতে তুলে দেবে। তারা পারে চালাবে, না পারে বন্ধ করে দেবে।

সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফিরতে গিয়েও হঠাৎ কি মনে হতে ফিরল না।··· রাত ন'টার পরে গেলে কি হয়।···উর্মিমালাকে ঘাড় ধরে বার করে দেওয়ার একটা উপলক্ষ যদি হাতে-নাতে পাওয়া যায়?···রাত ন'টায় প্রহ্লাদের ছুটি হয়ে যায়।···কিন্তু মলয় গুপ্ত যায় না।···দল নিয়ে কাল ওরা শিলিগুড়ি যাচ্ছে। জিনিস-পত্র গোছগাছ প্রহ্লাদই করে।

ঠিক ন'টায় ওর ছুটি না-ও হতে পারে। পল্লব দত্ত পৌনে দশটায় বা দশটায় যাবে।

কিন্তু হোটেলে বসেই আবার তার মত বদলালো। কালকের দিনটা সকলের ধকলের মধ্যে যাবে।...প্রহ্লাদের যদি ন'টাতেই ছুটি হয়ে যায়, মলয় গুপ্তও তারপর খুব বেশিক্ষণ থাকবে কিনা কে জানে। পল্লব পৌনে ন'টাতেই চলে এলো। উল্টো দিকের একটা বড় বাড়ির থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজের বাড়ির দিকে নজর রাখল। গাড়ি-বারান্দার দরুন জায়গাটা আবছা অন্ধকার। সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের শোবার ঘরের আলো জ্বলতে দেখছে। শীতের রাত তাই পাখা ঘুরছে না।

...ন'টা বাজার পাঁচ সাত মিনিট পরে প্রহ্লাদকে বেরিয়ে যেতে দেখল। তার পাঁচ মিনিট বাদে পল্লব দত্ত নিজের বাড়িতে পা দিলো। বাইরের দরজা দুটো ভেজানো। শব্দ না করে খুলল। নিঃশব্দে আবার ভেজিয়ে দিয়ে ওপরে উঠে এলো।

সামনের হল্ ঘরটাই বসার ঘর। আলো জ্বলছে। সেখানে কেউ নেই।

...শোবার ঘরের দরজা দুটো বন্ধ। পা-টিপে এগিয়ে গিয়ে পল্লব দরজার গায়ে কান পাতল। ভিতরে উর্মিমালার খিলখিল হাসি। আর মলয় গুপ্তর গলা।

পরিতৃপ্ত মুখে পল্লব একটা সোফায় এসে বসল। তখনো কি তার মাথায় খুন চেপেছিল? মোটেই না। সে জঞ্জাল সাফ করতে এসেছে। সে ব্যাপারে আর একটু সুবিধে হলো।

শোবার ঘরের দরজা খুলল আরো এক ঘণ্টারও পরে। সোয়া দশটারও পরে। উর্মিমালার স্রস্ত বসন, আলু-থালু বেশ।

যেন ভূত দেখে দুজনে একসঙ্গে চমকে উঠলো। উর্মিমালা প্রায় চেঁচিয়েই উঠলো, তুমি! তুমি এখানে মানে!

পল্লব হাসছে মিটিমিটি। আমি এখানে এক ঘণ্টারও ওপরে বসে, দরজা

বন্ধ দেখে তোমাদের ডিসটার্ব করি নি।…ও কি, মলয় তুমি পাল্লাচ্ছ কেন—তোমার প্রেয়সীকেও সঙ্গে নিয়ে যাও!

কিন্তু মলয় গুপ্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে নিচে নেমে গেল।

পল্লব দত্ত নির্লিপ্ত পায়ে শোবার ঘরে এসে দাঁড়ালো। মুখ থেকে কিছু-ক্ষণের জন্য মাত্র রক্ত সরে গেছল ঊর্মিমালার। তারপরেই রক্তবর্ণ মুখ করে সে-ও এসে ঢুকল। চিৎকার করে বলে উঠলো, ভেবেছ একটা দারুণ ফাঁদে ফেলেছ তুমি আমাকে? মিথ্যেবাদী কোথাকার, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, না ভেজানো ছিল? ধাক্কা দিয়ে খুললেই দেখতে আমরা একটা সিনের রিহারসাল দিচ্ছি—

নিজের সংযম দেখে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল পল্লব। নিজেকে সে এরই মধ্যে বড় আশ্চর্যভাবে খুঁজে পেয়েছে। শয্যার দিকে চেয়ে অল্প অল্প মাথা নাড়ল।—হ্যাঁ, বেড-সিনের রিহারসাল…।

আর রাখা-ঢাকার মধ্যে গেল না ঊর্মিমালা, সাপিনীর মতো ফুঁসে উঠলো।—হ্যাঁ বেড-সিনের রিহারসাল! তুমি কি ভেবেছিলে আমাকে, নিজের বিয়ে-করা সতী-লক্ষ্মী বউ? বছরের পর বছর ধরে তোমার সঙ্গে এই বেড-সিনের রিহারসাল দিই নি? বুঝেছ খুব ভালো হয়েছে, আরো আগে বুঝলে ভালো হতো, তোমার মতো হীন লম্পটের সঙ্গে আর একদিনও নয়, তোমার মতো বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে আর একদিনও নয়—আমার সব নিয়ে আমার সর্বনাশ করেও ভণ্ড কাপুরুষের মতো মনে মনে কার ধ্যান করে এসেছ আমি জানি না?

ইংগিত বোঝামাত্র স্নায়ু তেতে উঠছে পল্লব দত্তর।—খুব সাবধানে জিভ নেড়ো…আর কোনো কথার দরকার নেই, এই রাতটা তুমি তোমার এই সুখ-শয্যায় থাকো, কিন্তু কাল সকালে এসে তোমাকে যদি আর এ-বাড়িতে দেখি তাহলে বিপদ হবে।

রমণীর সুন্দর মুখ কত বীভৎস হতে পারে পল্লব দত্ত তাই দেখল। – কি?

আমি যাব? ও-দিকের তাক থেকে একটা বড় ফুলদানি হাতে তুলে নিলো।
—খুন করে হলেও তোমাকে আমি এ-বাড়ি থেকে তাড়াবো—অবন্তিকা থেকে তাড়াবো—থুঃ থুঃ থুঃ—ওই নাম মুখে আনতেও বমি পাচ্ছে··· গ্রুপের ওই নামও এবার আমি বদলে ছাড়ব—

': উর্মি! খুব সাবধান—

': কি সাবধান? পুড়ে ছাই হবার পরেও ওই কালামুখী তোমার বুক জুড়ে বসে আছে? ভণ্ড কোথাকার! তার নাম মুখে আনলেও তোমার আঁতে লাগে?—অবন্তী অবন্তী অবন্তী—হাজার বার বলব—তুমি একটা ছাগল না হলে তাকে তুমি সতী-সাধ্বী জ্ঞানে পুজো করো? অত বড় দেওরের সঙ্গে একেবারে নিরামিষভাবে যৌবনখানা কাটিয়ে দিলো—কেমন? আর দেওরেরও এত দরদ যে সতী-সাধ্বী বউদির জন্য জীবনে বিয়েই করল না! ওই সতী-সাধ্বী কালামুখীকে দায়-মুক্ত হবার জন্য কতবার লুকিয়ে নার্সিং হোমে যেতে হয়েছে সে-খোঁজ বরং নাওগে যাও—স্বপ্নরাজ্য থেকে তবে যদি তোমার মতো আহাম্মক মাটিতে নেমে আসতে পারে!

···এটুকুতেই পল্লব দত্তর মাথার প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ। অবন্তীকে পল্লব তিলে তিলে দগ্ধ করেছে, হত্যা করেছে। কিন্তু যার জন্য এই হত্যা সে ওই সামনে দাঁড়িয়ে। হত্যার দোসর সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এবার পল্লব নয়, ওই একজন আবার তাকে হত্যা করল, তার সামনে দাঁড়িয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করল। জঘন্য কুৎসিত অপমানের ফাঁস গলায় পরিয়ে হত্যা করল।

প্রথমে একটু বেগ পেতে হয়েছে। উর্মির হাতের ফুলের ভাসটা মাটিতে না পড়ে বিছানায় পড়ল বলে ভাঙে নি। গোটাকতক আঘাতেই তার দেহ শয্যায় লুটালো। কিন্তু তার পরেও সহজে তার গলায় হাত দিতে পারে নি পল্লব দত্ত। আঘাতে আঘাতে আরো নিস্তেজ করে তবে পেরেছে।

…তারপর চেয়ে চেয়ে দেখেছে খানিক। ফুলের ভাসটা তুলে জায়গায় রেখেছে। মদের বোতল মদের গেলাস নিয়ে বসল। দু'দিন খায় নি, তৃপ্তি করে অনেকটাই খেয়ে নিলো। একটা বড় কাজ শেষ করতে পেরেছে। নিশ্চিন্ত, নির্লিপ্ত। ভিতরটা বেশ চাঙা হবার পর থানায় ফোন করল।

বেশ খানিকক্ষণ নির্বাক আমি। তারপর বললাম, এ-কথা তুমি কোর্টে বললে না কেন? স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী দেখলে যে কোনো ঠাণ্ডা মানুষও তো তাকে খুন করে বসতে পারে—আর সেটা প্রমাণ হলে প্রাণদণ্ডও হয় না!

জবাব দিলো, ফাঁসি আমার প্রাপ্য শাস্তি…সেটা ঊর্মিমালাকে খুন করার জন্য নয়। তাই আমি কোনোরকম কনটেস্ট করি নি।

আবার খানিক চুপ করে থেকে জিগ্যেস করলাম, কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ কেন…এর মধ্যে লোককে জানানোর মতো হাস্যকর কৌতুকের ব্যাপারটা কি?

পল্লব একটু জোরেই হেসে উঠলো।—সেটা আপনার এখনো চোখে পড়ছে না? চোখ বুজে মাথা নিচু করে রইলো আধ-মিনিটের মতো। তারপর সোজা আমার মুখের দিকে তাকালো। মৃদু অথচ নিটোল গলার স্বর।

—খুন…মার্ডার…আমি একটাই করেছি, সেটা অবন্তীকে। এক-দিন দু'দিনে নয়, বছরের পর বছর ধরে তিলে তিলে হত্যা করেছি। সে-জন্যই সব থেকে নিষ্ঠুর মৃত্যুদণ্ড আমার প্রাপ্য। কিন্তু এই হত্যা করে আমি কি পেলাম?…কত লোকেই তো তা জানত, বিশেষ করে নাট্য-জগতের মানুষেরা, অনেক দর্শকও। কিন্তু তখন আমি নট-সম্রাট। এই হত্যা করে সকলের কাছ থেকে, সমাজের মানুষের কাছ থেকে আমি পেলাম দরদ সান্ত্বনা সহানুভূতি। সেগুলো এমনি স্বতঃস্ফূর্ত যে আমি নিজেই হতভম্ব।

আট-দশ সেকেণ্ড চুপ করে থেকে আবার মুখ খুলল।—একটা হিংস্র বাঘিনী যখন মানুষকে ছিঁড়ে খেতে থাকে তখন তাকে হত্যা করলে শাস্তি পাওয়ার কথা, না পুরস্কার? সমাজের বুকে রূপের আড়ালে হিংস্র

বাঘিনীর থেকেও নির্মম নিষ্ঠুর ছিল নাট্যোর্বশী উর্মিমালা। ছেলেবেলা থেকেই সে এই রূপের অস্ত্র নিয়ে নিষ্ঠুর খেলায় মেতেছিল। তার স্বামী পাগল হয়ে আত্মহত্যা করে বেঁচেছে—আর একটি সংসারকে সে মরুভূমি করে দিয়েছে। আমার অবন্তী হত্যার সে প্রধান সহচরী। কি কুৎসিত আর ভীষণ অথচ অব্যর্থ ছলাকলায় বছরের পর বছর ধরে আমার রক্ত শুষে খেয়েছে, আমাকে পাগল করেছে—আমার মেয়ের বিয়ের দিন পর্যন্ত তাকে অপদস্থ করে আত্মহত্যার পথে ঠেলে পাঠাতে চেয়েছে। এরপর তার লোভের শিকার মলয় গুপ্ত। ওর জন্য তার সংসারেও আগুন জ্বলতে শুরু করেছিল। উর্মিমালাকে আমি খুন করি নি, তাকে আমি সরিয়েছি। তাকে সরিয়ে আমি অনেক মানুষ, অনেক সংসারকে রক্ষা করেছি। মানুষের আকারে রক্ত-মাংসের এক নৃশংস জীবকে সরিয়ে দিয়ে সমাজের আমি একটা বড় রকমের উপকার করেছি। সেই পুরস্কারের বদলে আমি পেলাম মানুষের ক্রোধ ঘৃণা—তারা আমাকে ছিঁড়ে খেতে চাইলে—থুথু বৃষ্টি করে আমার শরীর ভিজিয়ে দিলে। ঈশ্বর বলে কোথাও যদি কেউ থেকে থাকে তার কি বিচিত্র রীতি দেখুন, যে হত্যার জন্য ফাঁসির থেকেও নির্মম শাস্তি আমার প্রাপ্য—তখন পেলাম মানুষের দরদ, সহানুভূতি, সান্ত্বনা। আর যে হত্যা করে সমাজের বুক থেকে একটা ভীষণ কাঁটা সরিয়ে দিলাম, কত জনকে বাঁচিয়ে দিলাম, কত সংসার রক্ষা করলাম—পুরস্কারের বদলে তাদের কাছ থেকে আমি পেলাম ক্রোধ ঘৃণা আর মৃত্যুদণ্ড। যখন অমানুষ ছিলাম, পশুরও অধম ছিলাম—তখন সমাজের চোখে আমি মানুষ—মস্ত মানুষ। আর যখন মানুষ হলাম, সেই সমাজের চোখেই তখন আমি পশুরও অধম অমানুষ।··

এর পরেও সমস্ত ব্যাপারটা আপনার কাছে একটা অদ্ভুত হাস্যকর কৌতুকের মতো লাগছে না?

আমি নিশ্চল বসে। মনে হচ্ছিল বুকের ভিতরে বাতাস কমে আসছে। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে কষ্ট হচ্ছে।